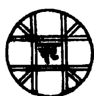
পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন

[১৮৯৭-১৯১৭]

পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন

[১৮৯৭-১৯১৭]

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী



ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া
২৮ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক : শ্যামল ভট্টাচার্য্য
ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
৩১শে আগষ্ট ১৯৮৩

মুদ্রাকর : সাধনা প্রেস
৭৩ এ, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

আমার মা'কে—

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

রামকৃষ্ণ মিশন একটি ধর্মীয় ও সেবা প্রতিষ্ঠান। এটি একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও বটে এবং মিশন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মত এ কথা বারবার ঘোষণা করেছিলেন যে এই সংস্থাটির সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নেই। কিন্তু তবুও ১৮৯৭ সাল অর্থাৎ যে বছর এটি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময় থেকেই ইংরাজের পুলিশ, মিশনকে চোখে চোখে রাখতে আরম্ভ করেছিল। এই বইতে অবশ্য কেবল মিশনের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে ১৯১৭ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত সময়ে মিশনের বিরুদ্ধে পুলিশ ও সরকারি কর্তৃপক্ষের নানা তৎপরতার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য সময়ের ঢের পরেও মিশন সম্পর্কে পুলিশের সন্দেহ বাতিক অব্যাহত ছিল। এ ব্যাপারে কয়েকটি প্রমাণ দাখিল করা যায়। ১৯৩২ সালের ১৪ই জুন তারিখে সেকালের বিখ্যাত ইংরাজি দৈনিক *Advance*-এর ৮ পৃষ্ঠায় 'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'-এর সূত্র উল্লেখ করে এই সংবাদটি ছাপা হয়:

Mymensingh June 12. Maharaj Narendranath, Sannyasi attached to the Ramkrishna Mission was arrested under the Bengal Criminal Law Amendment Act. It is reported that he had once been interned before he entered the Asram. ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও কোন এক প্রসঙ্গে এই মত মন্তব্য করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিশনকে নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের কোন এক মহলে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর গোটা ইংরাজ আমলে মিশনের বিরুদ্ধে আরো কি সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, খোঁজ করলে সে বিষয়েও অনেক তথ্য জানা যাবে বলে মনে হয়।

কালানুক্রমের বিচারে মিশন সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ড্যালি'র রিপোর্টে। ইনি ছিলেন বাংলা দেশের গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল। ৭ই আগষ্ট ১৯১১ তারিখে এঁর রিপোর্টটি লেখা হয়। এটি বর্তমানে মুদ্রিত অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়। এর পরে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলার থানা ডায়েরিগুলিতে মিশন সম্পর্কে নানা রকম গোপন নোট নথিবদ্ধ করে রাখা হয়। এগুলি ১৯১০ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে লেখা

হয়েছিল। বর্তমান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এগুলি সম্পর্কে যথা বিহিত আলোচনা করা হয়েছে। এর পরে টেগার্টের রিপোর্ট। এটি ১৯১৪ সালে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ যাবৎ অপ্রকাশিত, টেগার্টের এই দীর্ঘ রিপোর্টটি যথা সম্ভব অনুবাদ করে এই বইতে সঙ্কলন করা হয়েছে। সন্ধানী পাঠক রিপোর্টটি পড়তে গিয়ে অনেক সময়েই রীতিমত আহত বোধ করবেন। এক হিসেবে মিশন সম্পর্কে টেগার্টের বিষোদ্গারের অংশগুলি হয়ত বাদ দিলেই ভাল হত। বস্তুত সেগুলি এতই কুরুচিপূর্ণ যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় আমি 'টেগার্টের চোখে নিবেদিতা' নামে যে প্রবন্ধটি লিখি (৫ ডিসেম্বার ১৯৮২) সেখানে এই আপত্তিকর অংশগুলি একেবারে বাদই দিয়েছিলাম। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমার পরে মনে হয়েছে যে এগুলি বাদ দেওয়া ঠিক হবেনা, কেননা এগুলির মধ্যেই রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কুৎসিত মানসিকতার জলন্ত নমুনা। এই বিষোদ্গার সমূহের যোগ্য জবাব কোন এক জনকে দিতেই হবে এবং সেই কারণেই এগুলি হুবহু তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে।

টেগার্টের পরে কার্মাইকেলের দরবার বক্তৃতাতেও (১৯১৬) মিশন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়। এই বক্তৃতা পুলিশ রিপোর্ট নয়, কিন্তু তবুও এর সংশ্লিষ্ট অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে এই ভেবে যে, পুলিশের গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতেই এটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় নিয়ে সে সময় যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সুবাদে কার্মাইকেলের বক্তব্য সমর্থন করার জন্য আর এক প্রস্থ পুলিশ রিপোর্টের সাহায্য নেওয়া হয়। এগুলি সঙ্কলন করে-ছিলেন টিগেল এবং তাঁর রিপোর্টের (১৯১৭) সারমর্মও এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। মিশনের বিরুদ্ধে কার্মাইকেলের অভিযোগগুলির উত্তর ও প্রত্যুত্তর দেওয়ার সময়ে যে সকল আবেদন পত্র (representation), স্মারক (memorial) এবং চিঠি পত্র ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলিও এখানে যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। শেষোক্ত তালিকার বিভিন্ন নথি সেকালের বাংলা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গোপন ফাইলে সংরক্ষিত ছিল। এ গুলি বাদ দিলে আলোচ্য সময় সীমার অব্যবহিত পরে রাউলাট কমিটির রিপোর্টেও (১৯১৮) মিশন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছিল। এই রিপোর্টটি বর্তমানে বাজারে সহজলভ্য। কিন্তু এটি ছাড়া অন্য যে সব গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট এই বইতে সঙ্কলিত হয়েছে সেগুলি অদ্যাবধি কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা

যায়নি। এই কারণেই বর্তমান সঙ্কলনটি পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

মিশন সম্পর্কে পুলিশের সন্দেহ মানসিকতা লক্ষ্য করে আজকের যুগের অনেক পাঠকই হয়ত বিস্ময় বোধ করবেন। এই বিষয়ে দুটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। শাসক ইংরাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মিশন সম্পর্কে পুলিশের এই সন্দেহ বাতিকের কারণ খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। ১৮৯৪ সালে মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসব কিংবা বাংলা দেশে কালী মন্দিরে, গীতা হাতে নিয়ে বিপ্লবীদের দেশমাতৃকার নামে শপথ গ্রহণ—এ সবই এ দেশে ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তা বোধের পরিচয় বহন করে। ইংরাজরা যাঁদের সন্ত্রাসবাদী বলতেন সেই সকল উগ্রপন্থী বিপ্লবীদের মতাদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর *The Extremist Challenge* বইতে লিখেছেন "This is the story of an idea at once religious and political." মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনীতিতে ধর্মের এই অপরিসীম প্রভাব সরকারের চোখ এড়িয়ে যায় নি। তাই এ দেশের সন্ন্যাসী সমাজের কোন কোন অংশের উপর তাঁরা বরাবরই গোপনে গোপনে চোখ রাখতেন। এই গোপন প্রহরা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনও অব্যাহতি পায়নি। না পাওয়াটাই স্বাভাবিক, কেননা মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তিনিই আবার এ দেশের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ।

মিশনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতা যে এক সময় চরম আকার ধারণ করেছিল তারও একটা সঙ্গত কারণ আছে। বিগত ২রা জুন তারিখে গোল পার্কের মিশন ইনস্টিটিউটে আমি একটা বক্তৃতা দিই ; বিষয় : 'ব্রিটিশ গোয়েন্দার চোখে রামকৃষ্ণ মিশন'। বক্তৃতার শেষে ঐতিহাসিক নিমাই সাধন বসু তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন যে মিশন ছিল মানুষ গড়ার কারিগর। সে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি না করলেও ইংরাজের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত যথার্থ চারিত্র শক্তির মানুষ তৈরী করে চলছিল এবং সেটাই ছিল ইংরাজ সরকারের এক মাত্র দুর্ভাবনা। রাজনীতির লড়াইতে না নেমেও সে ইংরেজ সরকারকে অন্যভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। এটি কর্তৃপক্ষ চান নি। মিশন যদি প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি করত তাহলে বরং তাঁদের অনেক বেশী সুবিধে

হ্ত। কেননা সে ক্ষেত্রে তাঁরা মিশনকে রাজনৈতিক শত্রুর মত মোকাবিলা করতে পারতেন। এর ফলে এক কালের শক্তিশালী 'যুগান্তর' দল বা 'অনুশীলন সমিতি'-র মত রামকৃষ্ণ মিশনও হয়ত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হত। কিন্তু তা হয়নি, কেননা মিশন কখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেনি। অথচ সরকার ঠিক সেটাই চাইছিলেন। মিশনকে বারবার রাজনীতির দায়ে অভিযুক্ত করে রাজ সরকার জন সমক্ষে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, মিশন আসলে একটি রাজ-নৈতিক সংস্থা এবং রাজনৈতিক শত্রুর মতই এটিকে দমন করা দরকার। এটা সম্ভব হয়নি, কেননা মিশন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত প্ররোচনাকে এড়িয়ে গিয়েছে। অধ্যাপক বসুর এই ব্যাখ্যা কি পরিমাণ গ্রহণযোগ্য তা এই বইয়ের পাঠক এবং গবেষক সমাজ যেন বিচার করে দেখেন।

এই বই রচনায় আমি নানা জনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। বন্ধুবর আশিস গুপ্ত, প্রফুল্ল রায়, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুরজিৎ ঘোষ,— এঁরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের নিজেদের কাগজে আমার বর্তমান লেখার নানা অংশ ছাপিয়ে সহযোগিতা করেছেন। ডঃ আলো সরকার আমাকে এই কাজে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেন। পদ্মশ্রী অমিতাভ চৌধুরী আমাকে যে ভাবে সাহায্য করেছেন তা ভোলার নয়। সাংবাদিক এবং সুলেখক শঙ্কর ঘোষ-এর বই থেকে আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তিনি আমাকে বর্তমান প্রকাশকের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার একটি লেখা ছেপেছেন। অগ্রজ সাহিত্যিক বিমল কর তাঁর কাগজে আমার লেখার জন্য সর্বদাই জায়গা করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। কমল রায়চৌধুরী আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমার মেয়ে ইতিহাসের ছাত্রী নৈরঞ্জনা, তার নবীন উৎসাহে এই বইয়ের গ্রন্থপঞ্জী রচনা করে দিয়েছেন।

আমার স্ত্রী, ছবি রায়চৌধুরীও গ্রন্থরচনার কাজে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। আর যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন নীলিমা সরকার ও ঋতুপর্ণা রায়। আমার বাবা শ্রীপরিতোষ রায়চৌধুরী আমার সকল সারস্বত সাধনার মুগ্ধ অনুরাগী কিন্তু তাঁকে তো কৃতজ্ঞতা জানানো চলেনা!

কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন কমিশনার অনিলকৃষ্ণ রায় আমাকে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের নিকট পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং সেই সুবাদে আমি এমন

একটি প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি আসতে পেরেছি যার সংস্পর্শ আমার সারা জীবনের গর্বের সম্পদ। শঙ্কর মহারাজ ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু তিনি যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তা একমাত্র ইতিহাসের পরিশ্রমী গবেষকের পক্ষেই সম্ভব। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এই বইয়ের একটি অসাধারণ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। স্বামীজীর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এই কথাটি বলাটাও যেন ধৃষ্টতা। তাঁদের মত মানুষের কাছে কোন্ ভারত-বাসীই বা কৃতজ্ঞ নয়?

লোক চক্ষুর অন্তরালে আরও তিনজন আমাকে লেখালেখির ব্যাপারে সদাই উৎসাহ যুগিয়ে চলেছেন। এঁরা হলেন স্বর্গত অপর্ণা রায় চৌধুরী, নিমাই রায় চৌধুরী ও অর্দ্ধেন্দু শেখর সরকার। এঁদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার প্রণতি।

প্রেসিডেন্সী কলেজ/কলকাতা-৭৩
শুভ জন্মাষ্টমী, ১৪ই ভাদ্র ১৩৯০ — লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

ভূমিকা

অনেকে মনে করেন ভারতের প্রকৃত জাতীয় জাগরণ স্বামী বিবেকানন্দের জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। বিদেশে তিনি ভারতের যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে পাশ্চাত্য যেমন শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল, ততোধিক হয়েছিল তাঁর নিজের দেশ। ভারত এত দিন হীনম্মন্যতায় ভুগছিল, এবার নিজেকে চিনতে পারল। সে বুঝতে পারল তার নিজেকে দীন হীন মনে করার কোন কারণ নেই। তার নিজস্ব যে-সব সম্পদ আছে, তা পৃথিবীর কোন সমৃদ্ধ দেশের চেয়ে কম নয়। বিশেষতঃ উচ্চ চিন্তার ক্ষেত্রে ভারত দাতা, গ্রহীতা নয়। তার আত্মমর্য্যাদা বোধ ফিরে এল। সে বুঝল পরানুকরণের দ্বারা কোন দেশ বড় হয় না, বড় হয় নিজের শক্তিতে। স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতের আত্মঘাতী ভুল জনসাধারণের প্রতি ঔদাসীন্য। দেশের উচ্চবর্ণকে এর জন্য কঠোর ভৎর্সনা করেছিলেন স্বামীজী। তিনি মুচি-মেথর চণ্ডালকে 'ভাই' বলতে শিখিয়েছিলেন, মানুষের মধ্যে 'ভগবান'কে দেখতে বলেছিলেন। নূতন ভারতে শূদ্রশক্তির প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী—এই ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি করেছিলেন। তাঁর কথায় যেমন আশা ও আশ্বাস আছে, তেমন নিদারুণ শ্লেষও আছে। তাঁর কথা যেন বিদ্যুৎ-বাহী। তাঁর স্পর্শে সমস্ত ভারত জেগে উঠেছিল। দেশের প্রত্যেক তরুণ ও যুবকের কাছে তাঁর আহ্বান—"ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত" মন্ত্রের মত কাজ করেছিল। তাঁর সেই আহ্বান বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ সেবার কাজে হাজার হাজার তরুণ যুবক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং ক্রমশঃ তা দেশকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার সংগ্রামরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি বলেছিলেন: 'আগামী পঞ্চাশ বছর দেশ জননীই তোমাদের এক মাত্র আরাধ্য হোন'। প্রত্যক্ষ ভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান তিনি না জানালেও তাঁর দেশজননীকে সেবার আহ্বান-দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ কথা একালে যেমন ঐতিহাসিকেরা বলেন, সেকালে ব্রিটিশ শাসকরাও তাই মনে করতেন। এই বই তার খানিকটা সাক্ষ্য দেবে।

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে কখনও নামেননি। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধুরা যেন না নামেন, তাও বলে গিয়েছিলেন এ সাবধান বাণী যাঁরা শোনেন নি, তাঁদের শেষ পর্যন্ত মঠ-মিশন ছেড়ে যেতে হয়। যেমন নিবেদিতা। অবশ্য স্বামীজী বুঝেছিলেম নিবেদিতা রাজনীতি ছাড়তে পারবেন

না। তাই তাঁকে সব ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছিলেন। একই কারণে সন্ন্যাসও বোধহয় তাঁকে দেননি। তাঁর উগ্র রাজনীতি-প্রেম দেখেই বোধহয় তাঁকে বলেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরামর্শ নিয়ে চলতে। সেই পরামর্শানুসারেই তিনি স্বেচ্ছায় মঠ-মিশন ত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু মঠ-মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুর ছিল।

যে কারণেই হোক মঠ-মিশনকে ব্রিটিশ পুলিশ কখনই ভালো চোখে দেখেনি। খানিকটা স্বামীজীর জন্যে, আর খানিকটা বহু সন্ত্রাসবাদী তরুণ ও যুবক সন্ন্যাস নিয়ে মঠে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে। মঠে এসে তাঁরা আর রাজনীতি করতেন না, কিন্তু পুলিশ তা বিশ্বাস করত না। বিশ্বাস করত না বৃটিশ সরকারের শীর্ষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষও। ১৯১৬ সালে লর্ড কার্মাইকেল তাঁর দরবার ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনকে সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডা বলে বর্ণনা করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি এ মত প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলতেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তিনি বৃটিশ সরকারের গোপন কাগজ পত্রে দেখেছিলেন এক সময় (সম্ভবতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন) বৃটিশ সরকারের কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী চেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হোক। ভারত সচিব ঐ প্রস্তাব সুপারিশ সহ বড় লাটের কাছে পাঠান। একটি বিশেষ কৌশলগত কারণে বড় লাট সে প্রস্তাবে তখন সম্মতি দেননি। তবে তিনি সাদা পোষাকে গোয়েন্দা পুলিশকে বেলুড় মঠের উপর কিছু দিন নজর রাখতে বলেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে বৃটিশ আমলে পুলিশের সন্দেহ যে কখনও নির্মূল হয়নি তা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। কিন্তু পুলিশের ধারণা যাই হোক, রামকৃষ্ণ মিশন কিন্তু কখনও কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়নি। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সতর্কবাণী যথাযথ ভাবে মিশন পালন করে এসেছে। কোন সাধু হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে কোন আর্ত রাজনৈতিক কর্মীকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু তা থেকে এ দাঁড়ালো না যে রামকৃষ্ণ মিশন রাজনীতি করছে। অধ্যাপক লাডলী মোহন রায়চৌধুরীর বইএ পাওয়া যাবে রামকৃষ্ণ মিশনের বহু কর্মীর উপর পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবং এ সব কর্মী সরকার-বিরোধী কাজ কর্মে লিপ্ত। কিন্তু কারা এই সব কর্মী? খোঁজ মিলে দেখা যাবে এঁদের অধিকাংশ মঠ-মিশনের সন্ন্যাসী

কর্মী নন। হয়ত বেতন ভোগী কর্মীও নন। স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন। হয়ত মঠ-মিশনের কোন কেন্দ্রে যাতায়াত করেন, অথবা কোন বিশেষ সাধুর স্নেহভাজন—সে সাধু হয়ত জানেনেই না যে ঐ ব্যক্তি কোন গুপ্ত সমিতির সদস্য। কিন্তু এটা ঠিক যে-অহিংস বা সহিংস, যে ভাবেই হোক যাঁরা দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

পুলিশের রিপোর্টে আর এক জায়গায় ভুল। রামকৃষ্ণ-নাম যুক্ত প্রতিষ্ঠান হলেই তা রামকৃষ্ণ মিশনের নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র মনে করে এই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, তাঁদের কার্যকলাপে রাজনৈতিক গন্ধ থাকলে পুলিশ ধরে নিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের হয়েই তাঁরা রাজনীতি করেছেন। বহু ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন এ সব প্রতিষ্ঠান বা তাদের কর্মীদের অস্তিত্বের কথাও জানে না। এ কথা অতীতে যেমন সত্য ছিল এখনও তাই। বস্তুত: রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ নাম-যুক্ত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এখনও দেশে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সম্পর্ক নেই।

অধ্যাপক লাডলীমোহন রায়চৌধুরী বহু পরিশ্রম করে এই বই রচনা করেছেন। এই বই পড়লে জানা যাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ কিভাবে সেকালের তরুণ ও যুবকদের দেশ সেবার কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সম্বন্ধে বৃটিশ পুলিশের কিছু রিপোর্ট গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হল। এগুলির মধ্যে টেগার্টের রিপোর্ট অনেক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। যদিও তথ্যে অনেক ভুল আছে, তবু রামকৃষ্ণ আন্দোলনের গুরুত্ব তিনি যেভাবে বুঝতে পেরেছিলেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। রামকৃষ্ণ আন্দোলন একটি নিছক ধর্মীয় আন্দোলন নয়, জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের আন্দোলন। এ আন্দোলন অবশ্যই ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী, এ সত্য তিনি বুঝেছিলেন। কাজেই রামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রতি তাঁর বা তাঁদের বিরূপ মনোভাব স্বাভাবিক।

অধ্যাপক রায়চৌধুরী এই বইটি লিখে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ জন্যে তিনি ধন্যবাদার্হ। আশা করি এ বিষয়ে তিনি আরও লিখবেন।

ইতি

২৩ মে ১৯৮৩ — স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

DC 57/11 96. 117/4/16

All letters &c to be addressed to the President R. K. Mission.



Ramkrishua Mission,
Belur P. O., Howrah Dist.

Dated, the 7th April 1917.

No. R. ——

To
The Hon'ble Mr P C Lyon C.S.I.
Calcutta

Dear Sir,

I crave leave to remind you of your very kind promise to me to have the police guards [illegible] on two young members of the [illegible] Math taken off [illegible] the police authorities. We earnestly hope you will kindly leave the matter [illegible] decided [illegible] that effect. Thanking you in anticipation

I remain
Yours faithfully
Saradananda
Secy, Ramkrishna Mission

Addl. Secy — I made no [illegible] I would [illegible] resulted [illegible]. Told him [illegible] enquiries [illegible] to remove [illegible] issued. [illegible] carried. P C Lyon 7/4/17

পি. সি. লায়নকে লেখা স্বামী সারদানন্দের একটি চিঠির প্রতিলিপি

প্রথম অধ্যায়

রামকৃষ্ণ মিশনের সাংগঠনিক ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

এ হল এক অসাধারণ ঘটনার কাহিনী'।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকার ক্রিস্টোফার ইসারউড বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে কেবল একজন পবিত্র মানুষ, অতীন্দ্রিয় পুরুষ, সন্ত, বা অবতার হিসেবে ভাবা ঠিক নয়। এই সব উচ্ছ্বাসভরা সম্বোধনে একদল মানুষ হয়ত তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে, কিন্তু আরও একদল লোক এ সবে বিতৃষ্ণা বোধ করতে পারে। তার চেয়ে বরং ইংরাজীতে যাকে ফেনমিনন বলে, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকে সেই রকম কোন বিশেষণে অভিহিত করাই ভাল। এই অলোক-সামান্য চরিত্রের মধ্যে এত কিছু অসাধারণের সমাবেশ ঘটেছিল যে তাঁর সম্পর্কে ইংরাজী ঐ বিশেষণটিই সব চেয়ে সুপ্রযুক্ত। তাই ইসারউড তাঁর 'রামকৃষ্ণ এ্যাণ্ড হিজ ডিসাইপল্‌স্‌' গ্রন্থের সূচনাতেই বলে নিয়েছেন, '*দিস্‌ ইজ দি স্টোরি অফ্‌ এ ফেনমিনন*,'—এ হল সেই অসাধারণ ঘটনার কাহিনী।

আমাদের বর্তমান আলোচনাও ঐ একই কথা দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ বা তাঁর পারিষদবৃন্দের জীবন বৃত্তান্ত রচনায় উদ্যোগী হইনি। বর্তমান আলোচনা রামকৃষ্ণ মঠ এবং বিশেষত মিশনকে নিয়ে। কিন্তু এক হিসেবে সেও ত' একটা যুগান্তকারী ঘটনা, আর এক ফেনমিনন।

আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে ভারতবর্ষের একটা নিজস্ব ধারণা আছে। চতুরাশ্রম শাসিত হিন্দু সমাজে মানুষ শেষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এবং সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ করে বনে যায়। প্রপঞ্চময় জগতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তাই ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনায় এ দেশের মুনিঋষিগণ ইহ জগতের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করে স্বেচ্ছা নির্বাসনের জগতে বাস করেন। সন্ন্যাস জীবন সম্পর্কে ভারতবর্ষের এই সনাতন ধারণার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কঠোর নিয়ম শাসিত জীবন চর্যার কোন মিল নেই। আগের যুগের সন্ন্যাসীরা লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিমালয়ের নির্জন গুহায় কিংবা দুর্গম অরণ্যের নিভৃতে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকতেন। আর এ যুগের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা যেন

সংসারকে দুহাত দিয়ে আরো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরতে আগ্রহী। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মিশনের এই সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী সে কালের মানুষদের মনে কি রকম গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল, তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।[১] ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ কলকাতায় সেবার প্লেগের মড়ক দেখা দিয়েছিল। চিকিৎসা, সেবা আর ওষুধের অভাবে লোক যত না মরেছিল, রোগের আশংকায় তার থেকে আরো অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ আতংকে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। এই সর্বনাশা পরিস্থিতির মধ্যে শহরবাসী এক দিন সকালে সবিস্ময় লক্ষ্য করল যে গুটি কয় সন্ন্যাসী অপর কয়জন শুভ্র বেশা মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে মড়ক লাগা এলাকার ঘরে ঘরে গিয়ে আর্ত মানুষগুলোকে শুশ্রূষা করছেন, কোথাও বা তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন আবার কখনও বা দল বেঁধে পাড়ার জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে মেতে উঠেছেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। জীবন বিমুখ সন্ন্যাসীদের এই সেবাব্রত লক্ষ্য করে কেউ তাঁদের প্রশংসা করেছিলেন, আবার কেউ বা সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু নিন্দা বা খ্যাতি এইসব সন্ন্যাসীদের স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁরা ততদিনে বুঝে গিয়েছেন যে শিবজ্ঞানে জীব সেবা করাই হল প্রকৃত সন্ন্যাসীর ব্রত। "যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" অর্থাৎ পণ্ডিতগণ যাকে সন্ন্যাস বা জ্ঞান যোগ বলে নির্দেশ করেন, তা আসলে কর্মযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সেবা ধর্মের আদর্শকেই বাস্তবে রূপদান করার জন্ত পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মনীষী রম্যাঁ রল্যাঁ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের এক কৌতূহল জনক কাহিনী লিখে রেখেছেন।[২] মিশন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে স্বামীজী যে সময় মেতে উঠেছিলেন, তখন তাঁরই এক গুরুভাই এ বিষয়ে স্বামীজীর কাছে তাঁর সংশয় প্রকাশ করেন। পশ্চিমের সমিতিগুলির আদর্শে, রামকৃষ্ণের ধর্মমত প্রচার করার জন্ত একটি বিদেশী ধাঁচের সংগঠন গড়ে তুলবার প্রচেষ্টাকে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন যে, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও বোধ হয় এতটা বাড়াবাড়ি সমর্থন করতেন না। স্বামীজী এই অভিযোগ শুনে প্রথমে চুপ করে রইলেন। রাগে এবং উত্তেজনায় তাঁর সকল শরীর তখন কেঁপে উঠছিল। তার পর এক সময় ধীর অথচ আবেগ মথিত গলায় তিনি বলে ওঠেন: "তোমরা ভেবেছ আমার থেকে তোমরা রামকৃষ্ণকে অনেক বেশি বুঝতে পেরেছ, তাই তোমাদের এত ভক্তি, এত আবেগের উচ্ছ্বাস। কিন্তু কে তোমাদের রামকৃষ্ণের তোয়াক্কা করে? ভক্তি,

মোক্ষ বা শাস্ত্রের বচন, আমার কোন কিছুতেই আজ আর আসক্তি নেই। আমি বরং হাসি মুখে হাজার বার নরকে যেতে তৈরী আছি, যদি তার বিনিময়ে নানা দুর্গতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আমার এই হতভাগ্য দেশবাসীদের একবার মাত্রও কর্ম যোগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আমি রামকৃষ্ণ বা অন্য আর কারো সেবক নই। আমি শুধু তাঁরই আজ্ঞা পালন করব যিনি নিজের ভক্তি বা মুক্তির স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন।"

বস্তুত সেই দিন থেকে আর কেউ বিবেকানন্দের কাজের সমালোচনা করেন নি। ক্রমে ক্রমে তাঁরা সকলেই বুঝেছিলেন যে বিবেকানন্দের মত আর কেউ-ই দেশ বা ধর্মের প্রয়োজন এত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। এই উপলব্ধি বিবেকানন্দকে এত বিপুল ভাবে নাড়া দিয়েছিল যে গোটা দেশের সমস্যাগুলির মূল চরিত্রটি তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির সামনে নিমেষেই উদ্ভাসিত হয়েছিল।

"The national ideals of India are Renunciation and Service. Intensify her in those channels and the rest will take care of itself."

এ দেশের সমাজ জীবন হাজার রকম ব্যাধির প্রকোপে পীড়িত। কিন্তু সেগুলিকে আলাদা ভাবে উপশম করার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। ত্যাগ এবং সেবা ধর্মই হল ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের শাশ্বত আদর্শ। এ দেশের নানা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তখনই হবে যখন এই দুই আদর্শের প্রতি দেশকে পরিচালিত করা সম্ভব হয়ে উঠবে। উপনিষদে আছে, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব'। কিন্তু শুধু পিতা, মাতা বা গুরুকেই দেবতাজ্ঞানে সেবা করলে সব কিছু কর্তব্য সাঙ্গ হয়ে যাবেনা। 'ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের নিকট বলিপ্রদত্ত।' এই মা, কোন বায়ুভূত নিরালম্ব, কবির কল্পনা নয়। দেশের কোটি কোটি অসহায় মানুষের মধ্যে স্বামীজী এই দুঃখিনী মায়ের মূর্তিটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব হয়েছিল, "হে ভারত ভুলিও না, দরিদ্র ভারতবাসী তোমার ভাই, চণ্ডাল ভারতবাসী তোমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী তোমার ভাই।" তাই উপনিষদের ঋষির মত, আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।' ভারতের মৃত্তিকাকে তিনি বৃথাই তাঁর কৈশোরের উপবন বা বার্ধক্যের বারাণসী বলে বর্ণনা করেন নি। এই বিশ্বাসকে তিনি পরম

শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার মধ্যে লালন করেছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মতাদর্শকে তিনি কয়েকজন কৌপীনধারী, জীবনবিমুখ সন্ন্যাসীর নিভৃত ধর্মচর্চার সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। তাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন দেশের সেবায় এবং দশের কল্যাণে—বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় চ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার (১৮৮৬) মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর কাছে দীক্ষা নেওয়া সন্ন্যাসী ও অন্যান্য গৃহী ভক্তদের সংখ্যা এত বিপুল পরিমাণে বেড়ে উঠেছিল যে এঁদের একটি আলাদা সমাজে একত্র করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে ১৮৯৭ সালের ১লা মে তারিখে একটি সভা হয়। রম্যাঁ রলাঁ সেদিনের ঐ সভার একটি বিবরণ দিয়েছেন।[৩] তিনি জানান, বিবেকানন্দ ঐ সভার প্রধান বক্তা হিসাবে, একটি সুপরিচালিত সংগঠন ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের মতাদর্শ যে দেশবাসীর কাছে স্থায়ী ভাবে প্রচার করা সম্ভব হবে না, এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে, গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে এ-ধরনের কোন সংগঠন গড়ে তুলে যে বিশেষ ফল হবে না, এ কথা স্বামীজী ভাল করেই জানতেন। তাঁর মতে আপাতত এই প্রতিষ্ঠানটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত-চিত্ত কোন এক জন কর্ণধারের নেতৃত্বেই গড়ে তোলা উচিত। তার পর কঠোর নিয়মের অনুশাসনে ক্রমশঃ সংযত হওয়ার পর যে দিন প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সদস্য জনকল্যাণের স্বার্থে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংস্কারকে বিসর্জন দেওয়ার মত মানসিক শক্তি অর্জন করতে পারবে, সেই দিনই এই প্রতিষ্ঠানটিকে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা সঙ্গত হবে, তার আগে নয়। বলা বাহুল্য রলাঁর মতে বিবেকানন্দ, প্রস্তাবিত মিশনের একজন ডিক্টেটর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। রলাঁ মিশন প্রতিষ্ঠার সূচনায় বিবেকানন্দের মানসিকতা সম্পর্কে যে রকম বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, সে সম্পর্কে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য লেখায় আর কোন উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু পশ্চিমী রীতি অনুযায়ী বিবেকানন্দকে ডিক্টেটর বলা হোক আর নাই হোক, এ কথা সত্য যে মিশনের প্রথম যুগে তিনিই ছিলেন এর প্রধান প্রাণ পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে গুরুকে নিয়ে সব চেয়ে বেশি অভিমান ছিল স্বামীজীর। **The Sages of India** এবং **The Vedanta in all its phases** প্রসঙ্গে তিনি যখন মাদ্রাজ ও কলকাতায় বক্তৃতা দিচ্ছেন সেই সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর শিক্ষক, তাঁর আদর্শ ও সারা জীবনের একমাত্র নায়ক ও আরাধ্য দেবতা হিসেবে বর্ণনা

করেছিলেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যে সংগঠন তৈরী হতে চলেছে একমাত্র বিবেকানন্দই তার নেতৃত্ব গ্রহণের স্বাভাবিক অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিত্ব, কর্মোত্তম, পাণ্ডিত্য ও গুরুভক্তি,—এই সব গুণের জোরেই তিনি মিশনের প্রাণ পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। র্‌ল্যাঁ বলেছেন, In nomine et in signo Ramakrishna—রামকৃষ্ণের নামে এবং নির্দেশেই তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমী মতের অনুকরণে এ হেন সর্বজন স্বীকৃত নেতাকে 'ডিক্টেটর' বলা সঙ্গত কিনা সে কথা আর একবার ভেবে দেখা যেতে পারে।

বলরাম বসুর বাড়িতে সে দিনের ঐ সভায় ছয়টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রথম প্রস্তাবে রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জীবের সার্বিক কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল আদর্শ প্রচার করতেন এবং প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় তিনি স্বয়ং যে সব বিধি পালন করে চলতেন, সেই গুলিই জনসাধারণের মধ্যে আরো ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠন করা হবে। পৃথিবীর সকল ধর্ম আসলে এক সর্বতোমুখী বিশ্বজনীন ধর্মেরই অংশ মাত্র, এই বিশ্বাসে আস্থা রেখে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষগুলির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করাই হবে এই সমিতির একমাত্র কর্তব্য। সমিতির কর্ম পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে, প্রস্তাবিত রামকৃষ্ণ মিশন জনগণের ঐহিক এবং পারমার্থিক কল্যাণের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার কল্পে নিয়ত চেষ্টা করে যাবে। এই উদ্দেশ্যে মিশন শুধু ধর্মীয় ও বৈদান্তিক আদর্শগুলিই প্রচার করে ক্ষান্ত থাকবে না, পক্ষান্তরে কলা ও শিল্পের সম্যক প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনেও মিশন সচেষ্ট থাকবে। পঞ্চম প্রস্তাবে বলা হয় যে, মিশনের দুটি আলাদা শাখা স্বদেশ ও বিদেশের সর্বত্র আলাদা ভাবে সংগঠনের কাজ চালানোর জন্য গড়ে তোলা হবে। মিশনের ভারতীয় শাখার তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এইগুলির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ প্রচারে আগ্রহী সন্ন্যাসী এবং গৃহীভক্তদের বিশেষ ধরণের শিক্ষা (ট্রেনিং) দেওয়ার আয়োজন করা হবে। মিশনের বিদেশ সংক্রান্ত শাখার উদ্যোগে ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে ধর্মকেন্দ্র খোলা হবে এবং সেগুলির মাধ্যমে ভারতবর্ষ ও বিদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির মধ্যে এক পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির পরিবেশ রচনায় সাহায্য করা হবে। প্রস্তাবের সর্ব শেষ ধারাটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, যেহেতু ধর্ম এবং মানব হিতৈষা মিশনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য, সেই কারণে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতির

কোন সম্পর্ক একেবারেই রাখা হবে না—"The Aims and Ideals of the Mission being purely spiritual and humanitarian, it would have no connection with politics," শেষোক্ত এই অনুশাসনটি কি পরিমাণ মেনে চলা হয়েছিল তা নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলাচনা করা হবে। আপাতত এ সব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু নির্দ্বিধায় ঘোষণা করা যেতে পারে যে, মিশন সম্পর্কিত প্রথমোক্ত পাঁচটি প্রস্তাবের মাধ্যমে অধ্যাত্ম বিষয়কে এই প্রথম ইহ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে দেখা হল। আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করারও যে একান্ত প্রয়োজন আছে সে কথা মিশনের প্রতিষ্ঠাতাগণ এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি। ধর্মচর্চার সাথে সাথে বাস্তব জীবনের এই সব অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। ধর্মের মধ্যে যাঁরা গোঁড়ামির ছোঁয়া দেখে প্রায়শঃই আঁৎকে ওঠেন তাঁরাও স্বীকার করবেন যে মিশনের উদার ধর্মচেতনা বাস্তবের জড় বিজ্ঞানকে কোন ভাবেই অস্বীকার করেনি। এই আধুনিকতার মধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

স্বামীজী ১৮৯৭ সালের মিশন প্রতিষ্ঠা করার প্রায় দেড় বছরের মধ্যে আরো একটা বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছে। কলকাতা থেকে পাঁচ মাইল দূরে, দক্ষিনেশ্বরের অপর পারে বেলুড় নামক স্থানে গঙ্গার তীরে স্বামীজী একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেশ কিছু জমি কিনে ফেলেছেন। এই জমি কেনার ব্যাপারে স্বামীজীর অনুরাগী ইংরাজ মহিলা কুমারী হেনরিয়েটা এফ. মিলার (Henrietta F. Miller) এবং আমেরিকান শিষ্যা শ্রীমতী ওল বুল (Ole Bull) অকৃপণ ভাবে অর্থ সাহায্য করেন।[৪] এঁদের আর্থিক সহায়তায় এবং জনসাধারণের দানে ১৮৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে বেলুড় মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এই মঠটিই রামকৃষ্ণ সমাজের সকল সন্ন্যাসীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং এখান থেকেই স্বদেশ ও বিদেশের অন্যান্য মঠ ও শাখা কেন্দ্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করা হত।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরক্ত গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের এক জায়গায় মিলিত করার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বেলুড়ে মঠটি স্থাপিত হওয়ার পরে এখানেই সকলে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং ১৮৯৭ সালে যে মিশনটি প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রমে ক্রমে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে আসতে

থাকে। কেননা এখন থেকে বেলুড় মঠের পরিচালনাতেই মিশনের সমস্ত কাজ কর্ম সুষ্ঠু ভাবে নিষ্পন্ন করার সম্ভাবনা দেখা গেল। এই ভাবে প্রায় তিন বছর বাদেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাথমিক সংগঠনটি বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামটি ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই ঐ নামের প্রাথমিক সংগঠনটি বন্ধ হয়ে গেলেও লোকের মুখে মুখে নামটি তখনও টিঁকেছিল। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু তিন বছর আগে মিশনের নামে যে সব কাজ করা হত সেগুলি সমাধা করার দায়িত্ব এখন নব প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের উপরেই বর্তিয়েছিল।

কিন্তু এইভাবে কাজ করার একটা অসুবিধা ছিল। জন কল্যাণ মূলক কাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সন্ন্যাসীদের অনেক সময় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হত এবং এই উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ করতে হলে সন্ন্যাসী সমাজের একটি আইন সম্মত স্বীকৃতি লাভের প্রয়োজন। আইনের এই চাহিদা মিটানোর জন্য গোটা সন্ন্যাসী সমাজকে মঠ ও মিশন এই দুই ভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। এক্ষেত্রে যদিও দুটি প্রতিষ্ঠানকেই প্রধানত একই পরিচালকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে তবুও আইনের চোখে সে দুটি আলাদা সংগঠন বলে স্বীকৃতি পাবে। তাহলে মঠটি সন্ন্যাসী সমাজের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে Monastery বলে সেই হিসাবে কাজ করতে পারে এবং মিশনটির পক্ষেও একটি কল্যাণমূলক সেবা সংস্থান (Charitable Organisation) হিসাবে কাজ করা সম্ভব হবে। এই সব প্রয়োজনের কথা ভেবে ১৯০৬ সাল থেকেই মিশনের জন্য একটি আলাদা শাসন বিধি (constitution) তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।[৫] তিন বছর পরে এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়। বেলুড় মঠের আটজন ট্রাষ্টিকে নিয়ে একটি আলাদা পরিচালক মণ্ডলীর অধীনে রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক একটি সংবিধান ও নিয়মাবলী রচনা করা হয়। এই কাজ গুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৮৬০ সালের ২১ সং আইন (Act XX1 of 1860) অনুযায়ী ১৯০৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনকে আইনানুগ পদ্ধতিতে রেজিষ্ট্রি করা হয়। এই ভাবে মিশনের প্রথম পরিকল্পনাটি রচিত হওয়ার এক যুগ পরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম সমিতিবদ্ধ (incorporated) আকার লাভ করে।

স্বীকৃতি লাভের সময় 'রামকৃষ্ণমিশন সমিতির স্মারক' (Memorandam of Association of the Ramkrishna Mission) এবং 'রামকৃষ্ণ মিশন

সমিতির নিয়মাবলী' (Rules and Regulations of the Ramkrishna Mission) নামে দুটি আলাদা পুস্তিকা একত্র সম্বলিত করে সরকারী দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। ফুলস্ক্যাপ আকারের দশটি মুদ্রিত পৃষ্ঠায় এই স্মারক ও নিয়মাবলী একত্র সংযুক্ত করে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।[৬]

স্মারক পত্রের সাতটি ধারায় রামকৃষ্ণ মিশনের আইনানুগ অধিকার ও অবস্থা (status) বর্ণনা করে আটজন সন্ন্যাসী ১৯০৯ সালের ২০ শে এপ্রিল তারিখে নিজেদের একত্র সংঘবদ্ধ করে রামকৃষ্ণ মিশন নামক একটি সমিতি (society) গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[৭] মিশনের প্রথম পরিচালক মণ্ডলীর (governing body) যোলজন সদস্যের মধ্যে উপরোক্ত আটজন সন্ন্যাসীর সকলেই স্থানলাভ করেছিলেন।[৮] অবশ্য পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যার কোন উর্ধ্বতন সীমা নির্দ্ধারণ করা ছিল না। মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মাত্র চার বছর পরে মিশনের যে প্রথম সাধারণ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় (১৯১৩) সেখানে উনিশ জন সন্ন্যাসী নিয়ে গঠিত একটি নতুন পরিচালক মণ্ডলীর উল্লেখ পাই। এই তালিকায় মাঝে মাঝে কয়েকটি পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ১৯১৩ সালের তালিকায় স্বামী অচলানন্দ, মহিমানন্দ, শঙ্করানন্দ, ধীরানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ প্রমুখ পাঁচ জন সন্ন্যাসীর নাম সর্ব প্রথম অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। আবার স্বামী ত্রিগুণাতীত, রামকৃষ্ণানন্দ ও অদ্বৈতানন্দের মৃত্যুর পর এই তিন জনের নাম ১৯১৬ সালের তালিকা থেকে স্বাভাবিক কারণেই বাদ পড়ে। তাছাড়া এই সময় স্বামী অভেদানন্দ ব্রিটিশ ভারতের বাইরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার মনস্থ করায় মিশনের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর নামও ঐ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। মিশনের নিয়মাবলী সংশ্লিষ্ট ছয়টি ধারায় পরিচালকমণ্ডলীর গঠনতন্ত্র ও অধিকার সমূহ বর্ণনা কর হয়। সংশ্লিষ্ট প্রথম ধারাটিতেই এ কথা স্পষ্ট ভাবে জানানো হয় যে, ১৯০১ সালের ৩০ শে জানুয়ারী তারিখে বেলুড় মঠের অছিপত্র (Trust Deed) অনুযায়ী মঠের জন্য যে অছি সংসদ বা ট্রাস্টি গঠন করার নিয়ম হয় সেই ট্রাস্টিই মিশনের পরিচালক হিসাবেও দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এইভাবে মঠ ও মিশন পরিচালনার দায়িত্ব একটি মাত্র সংস্থার উপরে অর্পণ করে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মিশনের পরিচালনা ব্যবস্থার এই দিকটির সঙ্গে বিবেকানন্দের তথাকথিত একনায়কতন্ত্রী ক্ষমতা সম্পর্কে রম্যাঁ রঁল্যার পূর্বে উল্লিখিত মন্তব্যটি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।[৯]

স্মারকপত্রের দুই নম্বর ধারার অন্তর্ভুক্ত মোট আঠারোটি উপধারায় মিশনের উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী বর্ণণা করার পর সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে সেগুলি ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সকল উপধারাগুলির মধ্যে প্রথম সাতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করার বিষয় যে এগুলির মধ্যে এক মাত্র প্রথমটিতেই নিছক ধর্মীয় প্রয়োজনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়। বেদান্ত পাঠ ও বৈদান্তিক আদর্শ প্রচারে আগ্রহ সৃষ্টি করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত পথে তুলনামূলক ধর্ম সম্পর্কে প্রচার চালানোর উদ্দেশ্য এই ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ছয়টি ধারায় মিশনের দাতব্য, ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করা হয়। অন্য আর একটি ধারায় বলা হয় যে মিশনের সামগ্রিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান, সমিত্তি বা সংগঠনকে প্রয়োজন বোধে মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা চলতে পারে। এই উদ্দেশ্যে মিশনের নিয়মাবলীর অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে একুশটি উপনিয়ম (Bye-laws) প্রবর্তন করা হয়। এই সকল উপধারায় ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে স্থাপিত নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে মিশন কি ভাবে স্বীকৃতি দেবে এবং এগুলির সঙ্গে মিশন কি পরিমাণ সহযোগিতা করবে সে সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিখে রাখা হয়। মিশনের বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে পরবর্তীকালে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। সরকারী কর্তৃপক্ষের একাংশ এই সব শাখা প্রতিষ্ঠান ও মিশনের অন্যান্য মফঃস্বল আশ্রমগুলিকে ইংরাজ বিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রায়ই সন্দেহের চোখে দেখতেন। এই কারণে শাখা আশ্রমগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় মিশনের কি পরিমাণ যোগাযোগ থাকা সম্ভব ছিল তা খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। উপরোক্ত একুশটি উপবিধি পর্যালোচনা করলে এ সম্পর্কে সকল তথ্য বিস্তারিত ভাবে জানা সম্ভব। এই গুলিতে বলা হয়েছে যে, প্রতি বছরের যে কোন সময়ে বেলুড়ের মিশনে বারো টাকা চাঁদা পাঠিয়ে শাখা আশ্রমগুলি মিশনের স্বীকৃতি (affiliation) গ্রহণ করবেন। শাখা আশ্রমগুলি একুশ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি স্থানীয় কমিটির পরিচালনাধীন থাকলেও কেন্দ্রীয় মিশন এদের প্রত্যেকটির জন্য একজন পরিদর্শক (Supervisor) নিয়োগ করার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখেছিলেন এবং মিশন কর্তৃক মনোনীত এই পরিদর্শক স্থানীয় কমিটির এক জন সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন।[১০] সেবা কার্যের প্রয়োজনে এই সকল শাখা আশ্রমগুলির জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তোলার প্রয়োজন হলে, কেন্দ্রীয়

মিশনের নিকট যথা সময় আবেদন করে লিখিত অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হত এবং চাঁদা সংগ্রাহক ব্যক্তিকে মিশনের দেওয়া স্বীয় পরিচয়পত্রও সর্বদা সঙ্গে রাখতে হত। চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে এত সব কড়াকড়ি আইন রচনার পিছনে অনেকগুলি যুক্তি ছিল। একটি যুক্তি সম্ভবত এই যে, বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ চাইতেন না যে কেন্দ্রীয় মিশনের বা অন্যান্য শাখা আশ্রমগুলির সুনামের সুযোগ নিয়ে অন্য কেউ ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে জনসাধারণের টাকা সংগ্রহ করুক। বঙ্গ ভঙ্গ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার অল্প কিছু দিন পরেই বিপ্লবের প্রয়োজনে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য সবিশেষ তৎপরতা দেখা দেয়। রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ভাঙিয়ে যাতে আর কেউ এই সব গোপন উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করতে না পারে, সেই জন্যই মিশন কর্তৃপক্ষ সম্ভবত এতসব সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন।

মিশনের নিয়মাবলীর দুই থেকে সাত নম্বর ধারায় মিশনের সদস্যপদ লাভের জন্য যে সকল যোগ্যতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটিও লক্ষ্য করে দেখার মত। এই সব ধারায় মিশনের সন্ন্যাসী বা সাধারণ গৃহী সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার একমাত্র যোগ্যতা হিসাবে বলা হয়েছে যে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে বিশ্বাসী এবং মিশনের কর্মসূচীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি মিশনের সদস্য রূপে গৃহীত হতে পারেন। অবশ্য সদস্যরূপে স্বীকৃতি পেতে হলে তাঁকে মিশনের যে কোন একটি সভায় নির্বাচিত হতে হবে। তাছাড়া মিশনের পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনীত হলেও তিনি সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন। কিন্তু এগুলি হল আইনের কথা। আসলে মিশনের এমন কোন কঠোর বিধি ছিল না যার ফলে কোন ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক বা রাজনৈতিক মতামত, মিশনের সদস্য হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি পাওয়ার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারত।

পরবর্তীকালে মিশনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক কার্য কলাপের জন্য যখন সরকারী কর্তৃপক্ষ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন, তখন মিশনের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতাগুলি আর একবার যাচাই করে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময় মিশনের কর্তৃপক্ষ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মিশনের সদস্য হিসেবে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে কার সম্পর্ক আছে আর কার নেই, এসব কথা জানা খুব কঠিন। তাই মিশনের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে মিশনের সদস্যপদ

প্রার্থী সকল ব্যক্তিকেই অতঃপর এই মর্মে ঘোষণা করতে হবে যে; কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন গোপন সংগঠনের সঙ্গে তাঁর কোন রকম যোগাযোগ নেই। ঘোষণা পত্রের ইংরাজী বয়ানটা ছিল এই রকম, —

"I also declare that I have no connection whatever with any political or any secret body".

১৯১১ সাল থেকে এইভাবে স্বীকৃতি পত্র গ্রহণ করার রেওয়াজ চালু হয়। এর থেকে স্বতঃই প্রকাশিত হয় যে, অন্তত ঐ বছর থেকে মিশন কর্তৃপক্ষ বাহ্যত রাজনীতির সঙ্গে সকল রকমের সংস্রব সযত্নে এড়িয়ে যাওয়ায় আগ্রহী হয়েছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিশনের সদস্যভুক্তির পরিকল্পনায় এত বড় একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা হল, অথচ সে সম্পর্কে মিশনের গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে ('Members and Associates') কোন রকম সংশোধনী ধারা (Amendment) যুক্ত করা হল না। গঠন প্রণালীর বিন্দু মাত্র হেরফের ঘটানোর প্রয়োজন হলেও মিশন কর্তৃপক্ষ কিন্তু ইতিপূর্বে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীগুলির রেজিস্ট্রারের নিকট বিধিমত আবেদন করে ও নোটিশ দিয়ে, সেই সব সংশোধনী প্রস্তাবগুলি নথিবদ্ধ করে রাখতেন। উদাহরণ স্বরূপ সমিতিবদ্ধ হওয়ায় অল্প কিছু দিন পরেই মিশনের নিয়মাবলীর ১৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী, ২, ৭, ৯, এবং ১১ নম্বর উপবিধি (Bye-law) ও ১৩ (খ) সংখ্যক নিয়ম (Rule) সংশোধন করা হয় এবং এই সব সংশোধনীগুলি যথা বিহিত মূল গঠনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সাধারণ রিপোর্টের মধ্যেও এই রকমের কয়েকটি সংশোধিত ধারা যথা নিয়মে উল্লিখিত হয়। কিন্তু মিশনের সদস্যদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করে যে অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করানোর ব্যবস্থা হয়েছিল ১৯১১ সাল থেকে তা বহাল রাখা হলেও দু বছর বাদে ১৯১৩ সালের প্রথম মিশন রিপোর্টে বা তৎপরবর্তী সময়ের অন্য কোন প্রতিবেদনে সে সব কথা আভাসে ইংগিতেও উল্লেখ করা হয়নি।

মিশনের স্মারক পত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় প্রচার ও সাংগঠনিক কর্ম (Missionary work), দাতব্য (Charitable work) এবং শিক্ষা বিস্তার কর্ম (Educational work), মূলতঃ এই তিন ধরনের দায়িত্ব পালন করাই ছিল মিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। বিভিন্ন রকমের স্থায়ী ও সাময়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই সব দায়িত্বগুলি পালন করার চেষ্টা করা

হত। মিশনারী কাজ বা ধর্মপ্রচার ও সংগঠনের উদ্দেশ্যে যে সকল স্থায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্য নেওয়া হত সেগুলির মধ্যে সাতটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত হয়েছিল। যথা,

(১) রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়।

(২) রামকৃষ্ণ মঠ, কলকাতা।

(৩) রামকৃষ্ণ আলয় (The Ramkrishna Home), মাদ্রাজ

(৪) অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী।

(৫) বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

(৬) রামকৃষ্ণ মঠ, এলাহাবাদ।

(৭) রামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর।

এইগুলি ছাড়া আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলেও এই রকমের কয়েকটি স্থায়ী মিশনারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। ১৮৯৩ সালে স্বামীজী যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করার অল্প কিছু দিন পরেই তাঁর বাণী ও মতাদর্শ সে দেশের সর্বত্র এক অভূত-পূর্ব আগ্রহের সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের নানা এলাকার নাগরিকবৃন্দ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও বেদান্ত ধর্ম প্রসারের জন্য সে দেশে একাধিক কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য এগিয়ে আসেন। এঁদের সহায়তায় এবং মিশনের আনুকূল্যে, আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে নিম্নলিখিত পাঁচটি স্থায়ী ধর্মপ্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা—

(১) নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি : ১৮৯৪ সালে এই সোসাইটির গোড়া-পত্তন হয় এবং পরবর্তী চৌদ্দ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯০৮ সালে, সোসাইটির নিজ অর্থে নির্মিত একটি স্থায়ী ভবনে এটি স্থানান্তরিত হয়। পরের বছর নিউইয়র্ক থেকে রেল যোগে মাত্র তিন ঘণ্টার পথ, ওয়েস্ট কর্ণওয়াল নামক জায়গায় এই সোসাইটির উদ্যোগে স্বামী অভেদানন্দ কর্তৃক সম্পূর্ণ নতুন আর একটি বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) পিট্সবার্গ বেদান্ত সোসাইটি : ১৯০৬ সালে এই সোসাইটির পরিকল্পনা করা হয় এবং পরের বছর জানুয়ারী মাসে নিউ ইয়র্ক থেকে স্বামী বোধানন্দকে আনিয়ে এই সোসাইটির উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে, স্বামী বোধানন্দ যখন পুনরায় নিউইয়র্কে ফিরে আসেন সেই সময় বাধ্য হয়েই ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে এই সোসাইটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

(৩) ক্যালিফোর্ণিয়া—সানফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সোসাইটি : স্বামীজী দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্র সফর করার সময় ক্যালিফোর্ণিয়া, লস্ এঞ্জেলস ও সানফ্রান্সিস্‌কো প্রভৃতি জায়গায় ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ের উপর বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেন। সেই থেকে এই সব অঞ্চলের লোকেরা নিজ নিজ এলাকায় কয়েকটি বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করার কাজে উৎসাহ প্রকাশ করে। এইভাবে এই শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই সব অঞ্চলে বেদান্ত সোসাইটি গড়ে ওঠে।

(৪) বোস্টন বেদান্ত সোসাইটি : ১৯০৯ সালের গোড়া থেকেই বোস্টনে একটি স্থায়ী বেদান্ত সোসাইটি গঠন করার জন্য চেষ্টা হয়। এই কাজে স্বামী পরমানন্দ এবং ভগ্নী দেবমাতা বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হন। এঁদের মিলিত চেষ্টায় অবশেষে ১৯১০ সালে সেণ্ট বোটল্‌ফ ষ্ট্রীটে এই সোসাইটির একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্র থেকে 'দি মেসেজ অফ্ দি ইস্ট' (*The Message of the East*) নামে একটি বেদান্ত বিষয়ক মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হত।

(৫) ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি : স্বামী পরমানন্দের উদ্যোগে ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসাইটি বেদান্ত বিষয়ে পঠন পাঠনের জন্য যে সব বক্তৃতার আয়োজন করেন সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আগ্রহের সঞ্চার করে। ভগ্নী দেবমাতা এই কেন্দ্রের একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। পরবর্তী কোন এক সময়ে এই কেন্দ্রটি ৭নং টাউন সার্কেল অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত ও বহির্ভারত অঞ্চলে স্থাপিত উপরোক্ত বারোটি স্থায়ী কেন্দ্র ছাড়াও মিশনের উদ্যোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি স্থায়ী দাতব্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে মিশন অনাথ ও দুর্গত লোকেদের মধ্যে সেবা কার্য চালিয়ে যেত। বস্তুত মিশন পরিচালিত এই সকল সেবা কেন্দ্র সমূহের কাজ, অন্যান্য সকল ধরনের কাজের তুলনায় সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব অর্জন করে। এই সকল সেবা কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

(১) দি রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সার্ভিস, বেনারস। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি এক সময়ে মিশনের সঙ্গে যুক্ত বেনারস নিবাসী কয়েকজন যুবক অসুস্থ ও দুর্গত ব্যক্তিদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে "পুওর মেনস রিলিফ এ্যাসোসিয়েশন" নামে একটি দাতব্য সংস্থা গড়ে তোলেন। এই এ্যাসোসিয়েশন

থেকেই কালক্রমে মিশনের বেনারস সেবা কেন্দ্রটি জন্ম লাভ করে। প্রথম যুগে সেবা কেন্দ্রটি পর পর কয়েকটি ভাড়া বাড়িতে থেকে কাজ করে। পরে ১৯০৩ সালে কলকাতার এণ্টালি নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র নারায়ণ দেব ও শ্রীতারিণী চরণ পাল নামক অপর এক ব্যক্তি যথাক্রমে চার ও দুই হাজার টাকা চাঁদা দেওয়ায়, সেবা কেন্দ্রের জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়। পরবর্তী কালে এই কেন্দ্রের সংলগ্ন একটি হাসপাতাল, পাঠাগার ও বৃদ্ধদের জন্য একটি আবাস নির্মাণ করা হয়। নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা কার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রটি অচিরেই বেনারস এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সবিশেষ পরিচিতি অর্জন করে। ১৯১৪ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে সেবাকেন্দ্রের ত্রয়োদশ বার্ষিক সভায় বেনারস ডিভিসনের কমিশনার এইচ. এম. আর. হপকিন্স (H. M. R. Hopkins, I.C.S.) স্বয়ং অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে এই কেন্দ্রের সেবা কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১১]

(২) দি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল : বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দের আগ্রহে ১৯০১ সালের জুন মাস নাগাদ এই কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরে কলকাতা নিবাসী ভজনলাল লোহিয়া ও হর্ষিমল সুকদেব দাস নামক দুই জন নাগরিকের অর্থ সাহায্যে এই কেন্দ্রের জন্য দুটি স্থায়ী ভবন নির্মিত হয়। সেবাশ্রমটি কালক্রমে উক্ত এলাকার একটি প্রধান চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়।

(৩) দি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন : বৃন্দাবনগামী তীর্থ যাত্রীদের নানা অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতায় এই সেবাশ্রমটি ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে স্থাপিত হয়। কেন্দ্রটির পরিচালনায় বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা স্থানীয় জন সাধারণের সংকট মোচনে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। ১৯১২ সালের শেষ ভাগে প্রস্তুত একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে, ঐ বছর ঐ কেন্দ্রের উদ্যোগে মোট ২৪,৩৮২ জন লোককে চিকিৎসা ও মাসিক অর্থ-সাহায্য প্রভৃতি নানা রকম সহায়তা দান করা হয়েছিল।

(৪) দি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ : এলাহাবাদের মুথিগঞ্জ অঞ্চলে ১৯১০ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ যমুনা মিশন কলেজ রোডের নিকটে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয় এই কেন্দ্র থেকে এক সময় অসুস্থ ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়েও চিকিৎসা করানোর

ব্যবস্থা হয়। কালক্রমে এটি একটি স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯১৩ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এই কেন্দ্রের উদ্যোগে বিগত বছরে ৫৮৫৬ জন দরিদ্র রোগীকে সেবা করা হয়।

উপরোক্ত চারটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রধানতঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ অঞ্চলে দুর্গত ও রোগগ্রস্ত ব্যাক্তিদের চিকিৎসা করার জন্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এগুলি ছাড়াও বাংলা দেশের মফঃস্বল অঞ্চলে মিশনের উদ্যোগে অন্য আর এক ধরনের জন কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এই পঞ্চম কেন্দ্রটি হল "দি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম অরফ্যানেজ অফ্ মুর্শিদাবাদ"। এই অনাথ আশ্রমটির পরিচালক, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও আশ্রমটি সম্পর্কে এক সময় পুলিশ নানা রকম বিরূপ মন্তব্য করে। এই কারণে আশ্রমটির কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন ত্রাণ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় দুটি অনাথ বালকের দুর্দশা দেখে তিনি এই অঞ্চলে একটি অনাথ আশ্রম খোলার প্রেরণা বোধ করেন। তারপর মহুলা গ্রামের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ, এলাকার অন্য এক জন মহিলা জমিদার ও জেলা শাসক ই. ভি. লেভিঞ্জ (E. V. Levinge) এর সহায়তায় ১৮৯৯ সালে এই অনাথ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশ্রমে বারো বছরের নিম্ন বয়স্ক বালকদের ভরণ পোষণ করা হত। শুধু তাই নয় আশ্রমিকদের কারিগরি ও সাধারণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয়ও খোলা হয়। কালক্রমে আশ্রমের সংলগ্ন ছয়টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আশ্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় জেলার অভ্যন্তরে নানা রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আশ্রম গড়ে তোলারও ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাবে এই আশ্রমের নির্দেশে জেলা শহর বহরমপুর থেকে কিছু দূরে সরগাছি নামক গ্রামে আর একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। মোট কথা মুর্শিদাবাদের এই আশ্রমটি অচিরেই নিকটবর্তী এলাকায় সেবাকার্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের বন্যার ফলে যখন কলেরা মহামারী দেখা গিয়েছিল সেই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দের নেতৃত্বে এবং এই আশ্রমের উদ্যোগে দুর্গত অঞ্চলগুলিতে প্রশংসনীয় ভাবে ত্রাণ কার্য চালানো হয়েছিল।

মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুলির মধ্যে কয়েকটি, শুধু বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজেই নিযুক্ত থাকে। এদেশের সনাতন আদর্শের

সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করাই ছিল এই কেন্দ্রগুলির মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে মিশনের প্রথম যুগে তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়, যথা—

(১) ভগ্নী নিবেদিতার বিদ্যালয়: ১৮৯৯ সালে স্বামীজীর শিষ্য ভগ্নী নিবেদিতার উদ্যোগে ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে এই মহিলা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের কাজে ভগ্নী নিবেদিতা বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। তাছাড়া স্বামীজীর অপর একজন আমেরিকান শিষ্যাও এই বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন। ১৯১১ সালে নিবেদিতার মৃত্যুর পর এই বিদ্যালয় প্রচণ্ড অর্থ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েও ধীরে ধীরে এক সময় বিপদ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

(২) সরগাছি গণ শিক্ষা কেন্দ্র: স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রেরণায় মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে জন সাধারণের মধ্যে ব্যাপক হারে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(৩) দি রামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস্ হোম, মাইলাপুর, মাদ্রাজ: ১৯০৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই ছাত্রাবাসটি গড়ে তোলা হয়। এই ছাত্রাবাসে যথার্থ দুঃস্থ বালকদের শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষাদানের বিষয় গুলির মধ্যে কারিগরি বিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১৩ সালের মিশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ছাত্রাবাসের পরিচালনায় টেকনিকাল বিষয়গুলির উপর যে সব নিয়মিত পাঠ দেওয়া হত তা ক্রমেই বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কালক্রমে এটি মাদ্রাজের অন্যতম একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে।

১৯১৪ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে সেকালের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে মিশনের তৎকালীন সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ ঘোষণা করেন যে, একটি ক্ষেত্র ছাড়া গোটা বাংলা দেশের অন্য কোথাও মিশনের কোন শাখা আশ্রম (Branch centre) নেই। সে যুগের ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ব্যাপক পুলিশী তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে সারদানন্দ এই রকম বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেননা পুলিশের সন্দেহ ছিল যে, মফঃস্বলের একাধিক রামকৃষ্ণ মিশন শাখা আশ্রম গোপনে গোপনে বিপ্লব কর্মে সহায়তা করে আসছে। অথচ এক মাত্র বরিশাল ভিন্ন রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন শাখা আশ্রমের কোন অস্তিত্বই ছিল না। বরিশালের এই শাখা আশ্রমটি ১৯১১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মিশনের অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু তার আগে স্থানীয় ডেপুটি পোস্ট মাস্টার শ্রীশরৎচন্দ্র

চক্রবর্তীর উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েক জন ভক্ত একত্রিত হয়ে বেদান্ত পাঠ ইত্যাদি ধর্ম কর্মের প্রেরণায় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতিই কালক্রমে রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্রশাখা আশ্রম হিসাবে পরিচিত হয়। এই আশ্রমটি একধারে ধর্মপ্রচার ও ত্রাণ, উভয় প্রকার দায়িত্বই সাফল্যের সঙ্গে পালন করে।

১৯১৩ সালের বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সুবাদে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন সমিতি গুলির উপর পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করে এবং সেই সূত্রে মিশনের এই শাখা আশ্রমটিও পুলিশের নজর থেকে বাদ পড়ে নি। বাস্তবিক পক্ষে মিশন কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার আগেও বরিশালের এইআশ্রম ও তার বিভিন্ন কর্মবিধির উপর পুলিশ নজর রেখেছিল। ১৯১১ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী উৎসব পালনের যে আয়োজন করা হয়েছিল সেই সময়েও পুলিশ আশ্রমের উপর চোখ রেখেছিল। এই উৎসব উপলক্ষ্যে জেলার গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর শ্রীজে. সি. ভৌমিক ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জেলার পুলিশ কমিশনারের কাছে যে গোপন রিপোর্ট পেশ করেন তাতে জানানো হয় যে আশ্রম কর্তৃক আয়োজিত উপরোক্ত উৎসবে অশ্বিনী কুমার দত্ত, সতীশ চন্দ্র চ্যাটার্জী এবং শ্রীচরণ সেন প্রভৃতি জেলার সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।[১২] আশ্রমটি মিশনের অনুমোদন লাভের অব্যবহিত পূর্বে রাখাল চন্দ্র দাস ও রাজেন্দ্র লাল ব্যানার্জী প্রমুখ কয়েকজন সরকারী কর্মচারী আশ্রমের সদস্য পদ লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমতি প্রার্থনা করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ. ডব্লু. বথাম (A. W. Botham) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী এই অনুমতি দেওয়ার সময় আবেদনকারী সরকারী কর্মচারীগণকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, আশ্রমটির সদস্য হিসাবে তাঁরা যেন সংগঠনটির সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির কোন সম্পর্ক না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। আশ্রমটির সঙ্গে নিকট ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক যোগাযোগ আবিষ্কৃত হলে এই সকল সরকারী কর্মচারীগণ তার দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য থাকবেন। বস্তুত সরকারী কর্তৃপক্ষ মহলে বরিশাল আশ্রম সম্পর্কে এই সন্দেহের মনোভাব বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১৩]

উপরে উল্লিখিত স্থায়ী কেন্দ্রগুলি ছাড়াও, ধর্মপ্রচার ও ত্রাণ কর্মের জন্য মিশন মাঝে মাঝে সাময়িক ভাবেও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ত্রাণ কর্মের জন্য যে সব অস্থায়ী শিবির খোলা হত সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য

ও নির্দেশ প্রায়শই কেন্দ্রীয় মিশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যেত। কিন্তু ধর্মপ্রচারের জন্য মাঝে মাঝে যে সব জনসভা ও বক্তৃতার আয়োজন করা হত সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশনের কোন একটি কেন্দ্রের পরিচালনায় সংগঠিত হত। ১৮৯৭ সাল থেকে এই রকম বহু ধর্মসভা ও বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯০৬ সালে স্বামী অভেদানন্দ সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করার সময় এ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে এই ধরনের বহু ধর্ম সভায় বক্তৃতা দেন। মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরের রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের উদ্যোগেও প্রতি বছর দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে এই রকম ধর্মপ্রচার সভার আয়োজন করা হত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের যুগে উত্তর ভারতে এই ধরনের প্রচার সভার আয়োজন করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মিশনের প্রথম সাধারণ প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা হাজির করা হয়,—

"...Owing to the sudden outburst of public enthusiasm in favour of a political nationalism and the consequent perturbed and perverted state of the public atmosphere, preaching in public had practically to be stopped in Northern India since the rise of the recent Swadeshi Movement."[১৪]

বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের অব্যবহিত পরেই স্বদেশী প্রচার ও বিলাতি বর্জনের অভিযানে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। দেশ বিভাগের এক তরফা সরকারী হুকুমনামা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের চিত্তে এক তীব্র গ্লানি ও অপমানের জ্বালা সৃষ্টি করে। দেশের নানা জায়গায়, তখন প্রতি নিয়তই মিছিল, মিটিং প্রভৃতি নানা ধরনের রাজনৈতিক জনসমাবেশের মাধ্যমে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে অরাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য কোন সমাবেশ আহ্বান করা হলেও জনসাধারণ হয়ত সেগুলিতে উপস্থিত থাকার জন্য কোন আগ্রহ বোধ করত না। অর্থাৎ রাজনীতির প্রয়োজনই সব চেয়ে বড়, অন্তত দেশবিচ্ছেদের বেদনায় জর্জর বাঙালী সেই সঙ্কটের যুগে রাজনীতির ডাক উপেক্ষা করে কোন ধর্ম সভায় যোগ দিতে উৎসাহ পেতনা। তা ছাড়া আরো একটা বিষয় ভেবে দেখা দরকার। এই যুগে রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, পুলিশও প্রতিটি জনসমাবেশ ও সংগঠনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করে।

পুলিশের তরফে এই রকম ব্যাপক তোড়জোড়ের ফলে নিরীহ সাধারণ নাগরিকেরা এতই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে পুলিশের নজরে পড়ার ভয়ে তারা কোন ধরনের সভা সমিতিতেই আর যোগ দিতে ভরসা পেত না। অর্থাৎ সঠিক কারণ যাই হোক না কেন, মিশন কর্তৃপক্ষ এটা ঠিকই বুঝেছিলেন যে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগের মত বক্তৃতা ও জন সমাবেশের আয়োজন করে এখন আর বিশেষ লাভ হবে না।

অস্থায়ী প্রচার সভার মত, মিশনের উদ্যোগে বিশেষ বিশেষ সময়ে এক একটি দুর্গত অঞ্চলে সাময়িক ত্রাণ শিবিরও খোলা হত। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি আকস্মিক বিপর্যয়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এই সকল ত্রাণ শিবির, জন সাধারণের দুর্গতি মোচনে যথা বিহিত সাহায্য করত। মিশনের প্রথম যুগে, অর্থাৎ মিশনের প্রথম কার্য বিবরণী পেশ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই সকল সাময়িক ত্রাণ প্রচেষ্টার একটি হিসেব পাওয়া গিয়েছে। এগুলি সম্পর্কে একটি পূর্ণ তালিকা নীচে সংযোজিত হল।

১৮৯৭ থেকে পরবর্তী এগারো বছরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ত্রাণে অন্তত দশটি বিভিন্ন অঞ্চলে মিশন সেবাকার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এগুলি, হল, মুর্শিদাবাদ (১৮৯৭ ও ১৯০৮), দিনাজপুর (১৮৯৭), সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘর জেলা (১৮৯৭), চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণেশ্বর (১৮৯৭), রাজপুতানা অঞ্চলের কিষেণগড় (১৮৯৯-১৯০০), ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও নোয়াখালি জেলা (১৯০৬-০৭), ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা (১৯০৬-০৭) এবং পুরী (১৯০৮)।

বন্যা ত্রাণে তিনটি জায়গায় মিশন সেবাকাজ করে, যথা ভাগলপুর জেলার ঘোগা (১৮৯৯), চব্বিশ পরগণার বেহালা-বিষ্ণুপুর (১৯০০), এবং ঘাটাল মহকুমা ও হুগলি জেলার কিছু কিছু অংশ (১৯০৯)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে মাঝে মাঝেই মহামারী আকারে সংক্রামক প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হত। প্লেগের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য সরকারের উদ্যোগে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত তা অনেক সময়েই নিরীহ জন সাধারণের উপর অত্যাচারে পর্যবসিত হত। এই প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ডের (Mr. Rand) নিপীড়ণ মূলক ব্যবস্থার কথা স্মরণ করা যেতে পারে।[১৫] রামকৃষ্ণ মিশন প্লেগ রোগের মোকাবিলায় কলকাতা (১৮৯৯, ১৯০০), ভাগলপুর (১৯০৪, ১৯০৫ এবং ১৯১২) ও সাগর দ্বীপে (১৯১২-১৩) প্রশংসনীয় উদ্যম নিয়ে কাজ করে।

এছাড়া ১৮৯৯ সালে দার্জিলিং এর বিধ্বংসী ধ্বস, ১৯০৫ সালে পাঞ্জাবের অন্তর্গত ধর্মশালা অঞ্চলের ভূমিকম্প ও ভুবনেশ্বরের ব্যপক অগ্নিকাণ্ডের সময়ও (১৯১০) মিশন ত্রাণের কাজ করে।

রামকৃষ্ণ সমাজের ব্যাপক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বর্তমান আলোচনার জের হিসাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভেদ সম্বন্ধে এখানে আরো একবার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি যে ত্যাগ (Renunciation) ও সেবা (Service)ই ছিল রামকৃষ্ণ সমাজের প্রধান লক্ষ্য। এই দুটি উদ্দেশ্য সার্থকভাবে পালন করার জন্য দুটি পৃথক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রথম লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় (monastic order) গড়ে তোলা হয় এবং বেলুড় মঠেই এই সম্প্রদায়ের প্রধান কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ সেবাব্রতের মহান লক্ষ্যকে কার্যে পরিণত করার জন্য সন্ন্যাসী ও সংসারী, উভয় গোত্রের মানুষকেই সমবেত করে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইন অনুসারে এই দুইটি সংগঠনের স্বতন্ত্র সত্ত্বা, কিন্তু উভয়েই একই পরিচালক সমিতির অধীন। রামকৃষ্ণ মঠ (বেলুড়) এর অছি পরিষদকে মিশনের পরিচালক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করায়, এই দুটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মত একযোগে কাজ করতে পারত। অর্থাৎ আইনের চোখে মঠ ও মিশনের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও বাস্তব কর্মের জগতে এদুটি একই সংস্থার দুই সহযোগী প্রতিষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মিশনের কর্মপদ্ধতি ও অনুমোদিত বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে বিস্তারিত আলোচনাটি করা হয়েছে বর্তমান প্রসঙ্গে তার গুরুত্ব উল্লেখ করার প্রয়োজন।[১৬] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে মিশনের নানা কর্ম-কাণ্ড এবং অন্যান্য কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে পুলিশ অত্যন্ত গোপনে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করে দেয়। বস্তুত মিশনের বহির্ভারতীয় কেন্দ্রগুলিও পুলিশের সতর্ক নজরদারি এড়িয়ে যেতে পারেনি। এই সব কেন্দ্রে সন্ন্যাসীগণ ও বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ কোথায় কি করছেন, কি ভাবে প্রচার চালাচ্ছেন, কিংবা ত্রাণ কার্যের সুযোগ নিয়ে তাঁরা রাজনৈতিক ভাবে সন্দেহ জনক অন্য কোন ক্রিয়া কলাপ সুরু করেছেন কিনা, সে সব ব্যাপার খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা হত। এমন কি মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র ও আশ্রমগুলিতে প্রধানতঃ কোন্ শ্রেণীর লোক যাতায়াত করে সে সম্পর্কেও খোঁজ নেওয়া হত। পুলিশের একাধিক উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে মিশন ও তার মফঃস্বল আশ্রমগুলির বিরুদ্ধে নানা

অভিযোগও এনেছিল। এই সব অভিযোগের সারবত্তা বিচার করতে হলে মিশনের বিভিন্ন সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা রাখা অবশ্যই প্রয়োজন এবং সেই কারণেই এই বিষয়ে এই রকম বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল।

প্রসঙ্গত আরো একটি কথা বলা দরকার। মিশন সম্পর্কে পুলিশ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের সব অভিযোগগুলি কেবল একান্তভাবে গোপন রিপোর্টের মধ্যেই প্রকাশ করা হত। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার এফ্. সি. ড্যালি (F. C. Dally), হাচিনসন (Hutchinson), টেগার্ট (C.A. Tegart) বা বিচারপতি রাউলাট (S.A.T. Rowlatt) প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সময়ে মিশন সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য ও রিপোর্ট পেশ করেন, সেগুলি কেবল সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মহলের গুটি কয় প্রাণীই জানতে পারতেন।[১৭] ১৯১৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার লাট ভবনে লর্ড কার্মাইকেলের দরবার বক্তৃতায় সম্ভবত একবারের জন্য সর্বপ্রথম মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু সেবারেও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে মিশনের নাম উচ্চারিত হয়। আসলে মিশন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের যত অভিযোগই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ তথা গোটা ভারতবর্ষে মিশন ইতিমধ্যে যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, তার ফলে রাজপুরুষগণ এর বিরুদ্ধে আদালতের বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ না করে কোন বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে ভরসা পেতেন না। তাই মিশনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে গোপনে দৃষ্টি রাখলেও তাঁরা প্রকাশ্য ভাবে সব সময়েই মিশনের সেবাকার্যের প্রশংসা করে যেতেন। কার্মাইকেলের উল্লিখিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী দরবার বক্তৃতাতেও মিশনের সেবাকার্যের সপ্রশংস উল্লেখ ছিল।

কিন্তু এহ বাহ্য। মিশন কর্তৃপক্ষ হয়ত নিজেরাও বুঝতেন যে রাজপুরুষগণ মুখে যাই বলুন না কেন অন্তরে অন্তরে মিশন সম্পর্কে তাঁদের সন্দেহ মানসিকতা প্রবলভাবে শিকড় গেড়েছে। তাই সরকারী কর্তৃপক্ষের মন থেকে সন্দেহ মোচনে তাঁরা নিজেরাও কম সচেষ্ট ছিলেন না। বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যুগেই মিশন সম্পর্কে পুলিশের সন্দেহ সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার ঢের আগেই রাজনীতি সম্পর্কে মিশনের মনোভাবটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়। এ সম্পর্কে ১৮৯৭ সালের ১লা মে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের সভাপতিত্বে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, আমরা ইতিপূর্বেই তার উল্লেখ করেছি। মিশনের প্রথম সাধারণ

রিপোর্টের শেষ অংশে এই ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট ভাবে আলোচনা করা হয়। রিপোর্টে যাঁরা মিশন নির্দেশিত সন্ন্যাস ও ত্যাগ ব্রতের আদর্শকে তুচ্ছ জাগতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করার পক্ষপাতী তাঁদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল।

...we find people seeking to utilise the monastic spirit as a means to some material collective end,...the Swami pointed out that from the earliest ages, Renunciation has formed the central ideal, the pivot, on which the Indian scheme of life has been made to revolve and that no material or political end can ever supply the organising motive in the collective life of India.[১৮]

অর্থাৎ মিশন কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার পরিকল্পনা ইউরোপের অনুকরণে রচনা করা যাবেনা। আমাদের দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগের আদর্শেই গোষ্ঠী-জীবন গড়ে তুলতে হবে। কোনরকম জাগতিক অর্থাৎ সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা একেবারেই নিরর্থক। এক মাত্র ধর্মের প্রেরণাই নিখিল ভারতবর্ষের প্রতিটি লোকের মধ্যে মহান ঐক্যের যোগসূত্র রচনা করতে পারে। ত্যাগব্রতের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দেশের প্রতিটি নাগরিক এবং বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের নিকট মিশন কর্তৃপক্ষ তাই পার্থিব উচ্চাশা, ভোগ এবং প্রলোভন অথবা রাজনীতির সংকীর্ণ ও মাদকতাপূর্ণ আদর্শ উপেক্ষা করে দেশের কল্যাণ কর্মে আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানান।

"To such youngmen shielded by true renunciation from all the seductions of worldly ambition and enjoyment and the allurements of a narrow, exotic political ideal for their country, the Ramkrishna Mission sends forth its appeal, for the harvest indeed is full and we watch day to day, for the coming of the reapers."

রাজনীতিকে পরিহার করে চলবার জন্য এর থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট এবং প্রতক্ষ অঙ্গীকার বোধ করি সম্ভব ছিলনা।

কিন্তু তবুও রাজনীতি করার অভিযোগ এবং দায় মিশন এড়াতে পারেনি।

প্রকৃত পক্ষে ভারতের প্রতিটি ধর্মীয় সংগঠনকেই কোন না কোন সময়ে এই সব অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর একটা কারণ সম্ভবত, এই যে, ভারতবর্ষে ধর্মকে আশ্রয় করেই জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ হয় এবং এই জাতীয়তাবোধ, কাল ক্রমে ইংরাজ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্ম দেয়। ১৮৬০ এর দশকে রাজনারায়ণ বসু যে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন সেটি মূলত বঙ্গবাসী তথা ভারতীয় হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র আয়োজিত 'হিন্দু মেলা'ও বহুলাংশে ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে যে মা'কে বন্দনা করা হয়েছে তিনি ভক্ত হিন্দুর মাতৃরূপে আরাধ্যা দেবী। ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী উগ্র মতাবলম্বী রাজ-নৈতিক দলের প্রধান সমর্থক বালগঙ্গাধর তিলক কোন এক প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, ভারতীয় সমাজে একটি মাত্র মনোভাব যা সকলের মধ্যেই সাধারণ ভাবে উপস্থিত, তা হ'ল হিন্দুত্বের মনোভাব। মুসলমান বা খ্রীষ্টান দ্বারা অংশত অধ্যুষিত হলেও আমাদের দেশের গরিষ্ঠ জনসাধারণ হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং এই ধর্মের ভিত্তিতেই এ দেশের ঐক্য তথা জাতীয়তা বোধ গড়ে উঠেছে।[২০] বস্তুত ভারতবর্ষে জাতীয়তা বোধের উন্মেষে ধর্ম যে বিপুল পরিমাণে প্রেরণা যুগিয়েছিল সে কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে গিয়েছিল।[২১] এই প্রসঙ্গে বিচারালয়ে নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া ভাষণে যে কথা বলেছিলেন তা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

> "একদা বিশেষ প্রত্যয় সহকারে আমি একথা বলেছিলাম যে, এই আন্দোলন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এবং জাতীয়তাবাদও কোন রাজনীতি নয়, এ হল একটি ধর্ম, ধর্মমত বা বিশ্বাস। আজ সেই একই কথা আমি আর এক ভাবে বলতে চাই। জাতীয়তাবাদ যে একটি ধর্ম, ধর্মমত বা বিশ্বাস; সে কথার পুনরুক্তি না করে আমি বরং এখন বলতে চাই যে, এ হল সেই সনাতন ধর্ম যা আমাদের চোখে জাতীয়তাবাদের সামিল।"[২২]

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ তথা জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় ধর্ম ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শাসক সম্প্রদায়ের নজর এড়িয়ে যায়নি। তাই এ যুগের সব চেয়ে জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনকেও তারা দৃষ্টির আড়ালে রাখেনি। রাজশক্তির দৃষ্টিকোণে বিচার করলে কর্তৃপক্ষের এই সন্দেহ মানসিকতা স্বাভাবিক কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হতে পারে।

গোয়েন্দা পুলিশের এই মর্মে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল যে, ইংরাজ আমলের গোড়া থেকেই দেশের সর্বত্র এক শ্রেণীর রাজনৈতিক সন্ন্যাসী দলের আবির্ভাব হয়েছে। এই সকল সাধুরা যে বিভিন্ন সময়ে ইংরাজ বিরোধী ক্রিয়া কর্মে লিপ্ত ছিলেন এ বিষয়েও পুলিশ নানা সময়ে একাধিক রিপোর্ট পেশ করে।[২৩] সন্ন্যাসী কুল সম্পর্কে সন্দেহের এই সার্বিক পরিবেশের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনও এক অবাঞ্ছিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।

তথ্য সূত্র

১ Swami Lokeswarananda, Ramkrishna Order of Monks : A new orientation of monasticism. *Swami Vivekananda centenary Memorial Volume,* (ed.) Majumder, R. C. Calcutta, 1963, p. 439.

২ Rolland Romain, *The Life of Vivekananda and the Universal Gospel*, Calcutta, 1979, p: 124.

৩ ঐ, পৃঃ ১১৯।

৪ Swami Nirvedananda, Sri Ramkrishena and spiritual Renaissance. *The Cultural Heritage of India*, vol, II, Calcutta, year of publication not mentioned, p. 605.

৫ *The First General Report of the Ramkrishna Mission,* p. 2। এই রিপোর্টটি ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থের কোথাও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য নির্দেশ নেই।

৬ *The Ramkrishna Mission* শীর্ষক এই পুস্তিকাটি শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক হাওড়ায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস' নামক প্রেসে ছাপা হয়েছিল। প্রকাশের সন ও তারিখ পুস্তিকাতে উল্লিখিত হয়নি।

৭ স্বামী সুবোধানন্দ, শিবানন্দ, প্রেমানন্দ, শুদ্ধানন্দ, সচ্চিদানন্দ (১) অদ্বৈতানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং রামকৃষ্ণানন্দ।

৮ বাকি আটজন হলেন স্বামী সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, বোধানন্দ, আত্মানন্দ এবং বিরজানন্দ।

৯ টীকা নং ২ এর অনুরূপ। পৃঃ ১২০

১০ পরবর্তীকালে একুশ জন সদস্যের পরিবর্তে কম পক্ষে আট জন

সদস্যের কথা উল্লেখ করা হয়। এই সংশোধনী ধারা ১৯১৩ সালের মিশন রিপোর্ট লিপিবদ্ধ হয়।

১১ *The Fourteenth Annual Report of the Ramkrishna Mission Home of Service at Benares*, 1914, p. 11.

১২ Govt. of Eastern Bengal and Assam, Political Branch, Confidential. File no. 372/1910.

১৩ ঐ। D.O. no. 901C dt 13-3-1911, from A. W. Botham to W. G. Reid.

১৪ *The First General Report of the Ramkrishna Mission*, p. 33.

১৫ প্লেগ দমনে র‍্যাণ্ড-এর বাড়াবাড়ি সহ্য করতে না পেরে পুনার চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন তারিখে তাঁকে অতর্কিতে হত্যা করেন।

১৬ এই আলোচনা ১৯১৩ সালের মিশন রিপোর্ট প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য পরের যুগে মিশনের কর্ম কাণ্ড ও অনুমোদিত কেন্দ্র গুলির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল

১৭ বর্তমানে এই সকল রিপোর্টের কয়েকটি ইতিমধ্যেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : Ghose Sankar, *First Rebels* (A strictly confidential Police Report being a note on the growth of the Revolntionary movement in Bengal, submited by F. C. Dally, 7 August 1911), *Calcutta*, 1981 এবং *Report of the Sedition Commitee, 1918*, Calcutta, 1973.

১৮। *The Turst General Report of the Ramkrisna Misson*, p. 37.

১৯ ঐ, পৃঃ ৩৮।

২০ Wolpert Stanley A, *Tilak & Gokhale*, Berkeley, 1962. p. 201-02।

২১ Heimsath Charles H, *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, Princeton, 1964. p. 1?1-46.

২২ Ghosh, Aurobindo, *Uttarpara speech*, (4th edn.) 1943, p. 20.

২৩ দ্রঃ State Committee for Compilation of History of Freedom Movement in India : Bengal Region. Paper no. 49, Bundle no. 15. Political activities of the Sadhus upto 1909.

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোয়েন্দা রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে রাজনীতি করার অভিযোগ এবং দায় মিশন এড়াতে পারেনি। এই অভিযোগের মধ্যে কতটা সারবস্তু ছিল সেটা আলাদা কথা। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের উপর পুলিশ যে সব সময়েই সতর্ক প্রহরা মোতায়েন রেখেছিল এটা অত্যন্ত বাস্তব ঘটনা। বেলুড়ে মিশনের সদর কার্যালয়ে এই প্রহরা সব চেয়ে কঠোর ভাবে নিবদ্ধ রাখা হলেও, মফঃস্বল এলাকায় মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রেও গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারি কিছু মাত্র কম ছিল না। গ্রাম বাংলার সুদূর জেলা শহরগুলির কোথায় এবং কখন মিশনের সন্ন্যাসীরা ঘোরা ফেরা করছেন, এ সব খবর চরেদের মুখে পুলিশ আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখত। জেলাগুলির পুলিশ ডায়েরিতে কিংবা বেঙ্গল পুলিশ এ্যাবসট্রাক্ট অফ ইনটেলিজেন্স (Bengal Police Abstract of Intelligence) এ, এই সব সন্ন্যাসীগণের উপস্থিতির সংবাদ লিপিবদ্ধ করে রাখা হত এবং সেই সব নোটের ভিত্তিতে জেলার পুলিশ এবং অসামরিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে আরও ব্যাপক অনুসন্ধান চালানোর জন্য হুকুম জারি করতেন। বেচারা সন্ন্যাসীগণ হয়ত এ সব খবর ঘুণাক্ষরেও টের পেতেন না, কিন্তু তাঁদের অগোচরে পুলিশের গোয়েন্দারা সর্বদাই তাঁদের অনুসরণ করে বেড়াত। পুলিশের এই প্রকার তৎপরতা যে কি পর্যায়ে এসে পৌছেছিল সে সম্পর্কে কয়েকটি নিদর্শন নীচে সংশ্লিষ্ট ফাইল থেকে অবিকল উদ্ধৃত করে দেখানো যায়—

Extract from Bengal Police Abstract of Intelligence for the week ending 20th April, 1912.

Para. 1379 :—Bakarganj, 13. 4. 12.

Khoka Mukharji *alias* Sobadananda Swami.

One Khoka Mukharji *alias* Sobadananda Swami, of Belur Math, Howrah district and a member of the Ramkrishna Mission, has been at Barisal since the 25th March.

Note by S. D. :—Will the Superintendent of Police, Howrah please note and furnish a report on this Swami?

অন্যার্থ ১৯১২ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে বাখরগঞ্জের গোয়েন্দা ডায়েরির ১৩৭৯ নং অনুচ্ছেদে এই মত লিপিবদ্ধ হয় যে, হাওড়া জেলার বেলুড় মঠস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য স্বামী সুবোধানন্দ তথা খোকা মুখার্জী গত ২৪ শে মার্চ থেকে বরিশালে এসে রয়েছেন। কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগ (স্পেশাল ডিপার্টমেণ্ট) হাওড়ার পুলিশ সুপারকে এই সংবাদটি জানিয়ে তাঁকে উপরোক্ত স্বামী সুবোধানন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে খোঁজ নিয়েএকটি রিপোর্ট জমা দিতে বলে।[১]

১৯১২ সালের ১লা জুন তারিখে হাওড়া জেলার গোয়েন্দা ডায়েরির ১৮৬১ নং অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত একটি নোট লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত নোটে বলা হয় যে, স্বামী সুবোধানন্দ বেলুড় মঠের অন্যান্য অনেক সন্ন্যাসী সমভিব্যহারে বরিশালের জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের বাড়িতে এসে উঠেছেন। বরিশালে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারেই তাঁরা সকলে মিলে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। বাখরগঞ্জের পুলিশ সুপার যেন এই সব নবাগতদের চোখে চোখে রাখেন। বাখরগঞ্জ ডায়েরির নং ৩৪৮৭ অনুচ্ছেদেও (তাং ২৬শে জুলাই ১৯১৩) অনুরূপ আর একটি নোটে বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন কর্ম সমিতি গঠন এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তথা সতীশ চন্দ্র মুখার্জীর উপস্থিতির সংবাদ জানানো হয়েছে।[২] ঐ বছরের আরও একটি পুলিশ ডায়েরির নোটে বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের নির্বাচিত দশ জন সাধারণ সদস্য এবং অন্যান্য কার্য নির্বাহী সভ্যদের নামও লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।[৩]

অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে গোয়েন্দা ডায়েরির এই সব গোপন রিপোর্ট প্রশাসনিক মহলে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বাখরগঞ্জ ডায়েরির ৩৭৬৪ নং অনুচ্ছেদ (তাং ৫ নভেম্বর ১৯১০) বরিশালে রামকৃষ্ণ মিশনের সাংগঠনিক কাজে জনৈক দ্বারিকানাথ সেন নামক কর্মীর উপস্থিতি সংবাদ নোট করা হয়েছিল। সংবাদটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বিভাগের বড় কর্তা নাথান (R. Nathan), জেলা মাজিস্ট্রেট বথাম (A. W. Botham) এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনার রিড (W. J. Reid) এর মধ্যে গোপন নোট চালাচালি শুরু হয়ে যায়। নাথানের কাছে আগেই খবর ছিল যে উপরোক্ত দ্বারিকা নাথ সেন একজন রাজনৈতিক কর্মী (Political volunteer)।

তিনি একটি গোপন চিঠির মারফত (D. O. no. 1870 N. তাং 28. 11. 1910) এবিষয়ে রিড্' কে সতর্ক করে দিয়ে লেখেন যে, দ্বারিকাকে আদৌ সুবিধাজনক লোক বলে মনে হয় না, এবং জেলার যে সকল সরকারী কর্মচারী বরিশাল রামকৃষ্ণ সমিতির[8] সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁদের এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ("He does not appear to be a suitable person with whom government servants should work)। দ্বারিকনাথ সম্পর্কে আরও ভালভাবে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য নাথান জেলার সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টার রায়সাহেব জে. সি. ভৌমিককেও নিযুক্ত করেন। বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বথামও নাথানের সঙ্গে এক মত হয়ে জেলার সরকারী কর্মচারীদের এবং বিশেষভাবে বরিশাল রামকৃষ্ণ সমিতির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সত্যভূষণ দাসকে দ্বারিকার সঙ্গে মেলা মেশা করতে নিষেধ করে দেন। রিডের কাছে লেখা গোপন চিঠিতে (D. O. No. 794-C তাং 26. 1. 1911) বথাম লেখেন "I have warned Satya Bhusan Das and the Goverment servants who are members of the Mission that they are to have nothing to do with this man and that his association with the Mission brings it under grave suspicion." অর্থাৎ দ্বারিকনাথের সঙ্গে বরিশাল রামকৃষ্ণ সমিতির যোগাযোগ যে গোটা সমিতিটিকেই পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন করে তুলেছে এ কথাও বথাম অকপটে কবুল করেছিলেন। নাথান এবং বথামের উপরোক্ত রিপোর্টগুলির সারমর্ম, রিড্ কর্তৃক ভিচ্ (H. M. Veitch) নামক অপর এক পদস্থ রাজপুরুষের কাছেও যথাসময়ে প্রেরিত হয়েছিল।[৫]

বাখরগঞ্জ পুলিশ ডায়েরির ৩১৭৭ নং অনুচ্ছেদে (তাং ১৭।৯।১৯১০) দ্বিতীয় ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। এই নোটে বলা হয়, করিমগঞ্জ (শ্রীহট্ট) রামকৃষ্ণ মিশনের রাসু রাজদস্তি নামক জনৈক সদস্য ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের খুলনা মেলে বরিশালে এসে পৌঁছেছেন এবং পুলিশ বর্তমানে তাঁর গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। এই নোট পাওয়ার পর শ্রীহট্টের পুলিশ সুপারকে এই ব্যক্তিটির শ্রীহট্টে অবস্থানকালীন ক্রিয়া কলাপ সম্পর্কে সব কিছু সত্বর জানাতে অনুরোধ করা হয়েছিল। এবারেও ঢাকা বিভাগের কমিশনার রিড্, আগের মত নাথানের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন (Confidential, No. 1774-S তাং 4.11.1910) এবং সেই সঙ্গে বথামকেও এত্তেলা পাঠিয়ে-

ছিলেন। চিঠির উত্তরে বথাম লেখেন উপরোক্ত রাজুদস্তি, বরিশাল জেলার নলচিতি পুলিশ থানার অন্তর্গত বৈচণ্ডী গ্রামের রামকানাই চক্রবর্তীর পুত্র রসিক চন্দ্র চক্রবর্তী। সন্ন্যাস নেওয়ার পর তিনি রসরাজ উদাসীন (রাসু রাজুদস্তি নয়) নাম নেন। ইনি যথার্থই শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি কালীঘাট এবং নবদ্বীপ থেকে তীর্থ যাত্রা সেরে ইনি বরিশালে জনৈকা স্বর্ণ বৈষ্ণবীর কুটিরে এসে উঠেছেন। সন্দেহ উদ্রেক করার মত কোন খবর এর বিরুদ্ধে যোগাড় করা না গেলেও পুলিশ যে ভাবে এঁর নাড়ি নক্ষত্রের সংবাদ টেনে বার করেছিল তার থেকে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে পুলিশের ব্যাপক নজরদারির প্রকৃত স্বরূপটি বোঝা যায়।[৬]

১৯১৩ সালের গোয়েন্দা ডায়েরির অপর একটি রিপোর্টে বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা কি ভাবে বন্যা ত্রাণ কাজ চালাচ্ছেন সে বিষয়েও কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।[৭] এই রিপোর্ট কাঁথির বালিগড়ে বন্যা ত্রাণ কর্মী সতীশ বসু এবং বর্দ্ধমানের ত্রাণ কর্মী অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী, মাখন লাল সেন, যতীন মুখার্জী এবং রামচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ মিশনের সঙ্গে জড়িত কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবী সম্পর্কে পুলিশের ধারণা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। গোয়েন্দা পুলিশ জানায়—

Our enquiries in Eastern Bengal show that the various branch samities of this asram, which have recently been opened there, are used as a cover for the spread of sedition among the local people. Any attempt to further spread the work in the Burdwan and Midnapur districts will, therefore, require to be carefully watched, and I am having enquiries made to ascertain what has actually been done in this connection.

অর্থাৎ সেবা কর্মের ছুতোয় মিশনের গ্রাম আশ্রমগুলি কিংবা মিশনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিগণ যে মফঃস্বল বাংলায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে রাজবিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছেন এ সম্পর্কে পুলিশের কোন সন্দেহ ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে, এই রকম সংবাদের ভিত্তিতেই টেগার্ট তাঁর রিপোর্টের নবম অধ্যায়টি ("গ্রাম আশ্রমগুলির বিকাশ") প্রস্তুত করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন এবং বিশেষ করে বেলুড় মঠ সম্পর্কে সরকার বরাবরই একটি

আশংকার ভাব পোষণ করে এসেছিলেন। এদিকে মুস্কিল হয়েছিল এই যে, সন্দেহ সন্দেহই, মিশন যে রাজদ্রোহিতার কাজে যথার্থই প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিল এমন কোন সরাসরি প্রমাণ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যোগাড় করে উঠতে পারেন নি এবং এই প্রমাণের অভাবে দেশের আইন অনুযায়ী মিশনকে প্রত্যক্ষ ভাবে অভিযুক্ত করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আরও একটি অসুবিধা ছিল। রামকৃষ্ণ মিশন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনমানসে তার প্রভাব এতই গভীর ছিল যে স্রেফ সন্দেহের বশে এমন একটি সর্বজন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানকে বিব্রত করা সরকারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন অভিযোগ না আনলেও বেলুড়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বদাই চোখে চোখে রাখতেন। এমন কি সরকারী কর্মচারীগণকেও প্রচ্ছন্ন ভাবে মিশন এবং তৎ সম্পর্কিত যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে উপদেশ দেওয়া হত। গেরুয়া ধারীদের নিয়ে সরকারের মাথা ব্যথা যে কী ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তা বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম যুগের ইতিহাসটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে।

১৯০৪ সালের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ অনুরাগী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এবং প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত সহ বরিশাল জেলার আরও কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ধর্মীয় ও সেবাকার্যের মহৎ উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ সমিতির গোড়া পত্তন করেন। সমিতির অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন সরকারী কর্মচারী। ১৯০৪ থেকে ১৯১০ সাল অর্থাৎ মোটামুটি এই ৬/৭ বছর সময়ের মধ্যে সমিতির তরফে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে চিকিৎসা বিতরণ ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পীড়িত এবং ঘাটাল মহকুমার বন্যাদুর্গত মানুষদের ত্রাণ কাজে সাহায্য করার জন্য নগদ অর্থ সাহায্য এবং এই রকমের আরও অনেক কল্যাণকর্ম সুসম্পাদিত হয়। সমিতির সদস্যগণ স্টীমার ঘাটে সমবেত যাত্রীদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে এবং গ্রামবাসীদের দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করে যে অর্থ সঞ্চয় করতেন তাই দিয়েই তারা জগদানন্দ দাশগুপ্তের দান করা এক টুকরো জমির উপর নিজস্ব ভবন নির্মান করেন। এই ভবনে একটি লাইব্রেরী ছিল এবং এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে ধর্মালোচনা হত।

এই রকম একটি সর্বতোভাবে জনহিতকর এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্পর্কে কোন পক্ষেরই কোন রকম আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তবুও জেলার সরকারী কর্মচারীগণ সাবধানে এগোনোর পক্ষপাতী ছিলেন।

তাঁরা সরাসরি বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১০ তারিখে লিখিত ভাবে আবেদন করে জানতে চাইলেন যে সরকারী কর্মী হিসেবে এই সমিতির সঙ্গে তাঁদের যুক্ত হওয়া সম্পর্কে সরকারের কোন আপত্তি আছে কি না,—

We beg to submit that it is needless to say we restricted our humble work and services within the pale of pure religion and benevolence. Members from the very inception of the Mission strictly abstained themselves from any political and social controversy. Now as the institution is a body consisting of the majority of government servants we naturally feel it our bounden duty to respectfully approach your honour with a view to be instructed if your honour entertains any objection to our leisure-time enjoyment.

স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্র কুমার সেন, রাখাল চন্দ্র ঘোষ, আনন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত, হেম চন্দ্র সেনগুপ্ত, রসিক লাল দাশগুপ্ত, বঙ্কিম চন্দ্র রায়, অক্ষয় কুমার ব্যানার্জী, দেবেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী এবং সতী প্রসন্ন গুহ।

আবেদনকারীগণ উপরোক্ত দরখাস্তটি পেশ করার ঢের আগেই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বরিশাল মিশনে সরকারী কর্মচারীদের এই একাধিপত্য লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরা ব্যাপারটি নিয়ে গোপনে গোপনে গভীর ভাবে চিন্তাও করেছিলেন। ইস্টার্ন বেঙ্গল এবং আসাম সরকারের চীফ সেক্রেটারীর ডিপার্টমেন্টের ১৯১০ সালের একটি গোপন ফাইলে এ সম্পর্কে সরকারী আমলাদের নানা ধরনের নোট ও মন্তব্যগুলি সংরক্ষিত আছে।[৮] এটি খুঁটিয়ে পড়লে জানা যায় যে উপরোক্ত আবেদন পত্রটি জমা পড়বার আগেই সরকারের তরফে পূর্বে উল্লিখিত নাথান এ বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত হবে না বলেই অভিমত প্রকাশ করেন। নাথানের নোটটি ১৯১০ সালের ২০শে মার্চ তারিখে লিখিত হয়েছিল। তিনি বলেন

But until there is some reason to believe that the Barisal association takes a part in objectionable proceedings we need not I think interfere further.

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বথামও এ বিষয়ে নাথানেরই মতের সমর্থক ছিলেন। এই দুই পদস্থ সিভিলিয়ানের মতৈক্য বিভাগীয় কমিশনার রিডের কাজের অনেক সুবিধা করে দিয়েছিল। অতএব পূর্বোক্ত আবেদনকারীগণের দরখাস্তটি সম্পর্কে রিডের অভিমত জানতে চাওয়া হলে তিনি লেখেন যে, মিশনে সরকারী কর্মীদের যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সরকার 'হাঁ' বা 'না' কোন কথাই বলতে প্রস্তুত নন। তবে এখানে যোগ দেওয়ার আগে তাঁদের একটা বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া উচিত এবং তা হল এই যে আপত্তিকর রাজনৈতিক ক্রিয়া কাণ্ডে লিপ্ত এমন কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া যে কোন সরকারী কর্মীর পক্ষেই সম্পূর্ণ বে-আইনী। রিড লেখেন—

Botham is of opinion that as the Mission exists it is perhaps not a bad thing that our own men should belong to it and I am inclined to agree with him. If I may suggest I think that Botham might be instructed to tell the clerks who have applied to him that he can neither give nor withhold permission to belong to the Mission, that Government servants are aware of the orders regulating their conduct and in particular of the recent order which forbid Government servants from belonging to bodies which have objectionable political objects and that he has nothing more to say.

উপরোক্ত চিঠিখানি থেকে আরও একটি তথ্য জানা যায়। বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য বেলুড় মিশনের উদ্যোগে মাঝে মাঝে যে সব সাহায্য ভাণ্ডার গঠন করা হত তাতে সাধ্য মত সাহায্য করার জন্য বরিশালের মিশন প্রায়ই চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠাত। কিন্তু ব্যাপারটি জেলা কর্তৃপক্ষের আদৌ মনঃপূত হয়নি। তাই বরিশাল মিশনের সঙ্গে যে সব সরকারী কর্মচারী যুক্ত ছিলেন, খোদ জেলা শাসক একদিন তাঁদের ডেকে নিয়ে এসে বলেন যে, তাঁদের দ্বারা সংগৃহীত অর্থ এই ভাবে বেলুড়ে পাঠানোর আগে তাঁরা যেন কি ভাবে সেই অর্থ খরচ হচ্ছে সেটাও যাচাই করে দেখেন। পূর্বে, কাঁথি এবং বর্দ্ধমানে অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, মাখন লাল সেন, যতীন মুখার্জী প্রমুখ ত্রাণ কর্মীগণের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এঁরা গোপনে গোপনে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়া কর্মে লিপ্ত আছেন বলে পুলিশের খবর ছিল এবং তারা এই মর্মে সন্দেহ করত যে রামকৃষ্ণ মিশনই

এদের প্রচ্ছন্ন ভাবে মদত যুগিয়ে আসছিল। এই সন্দেহের কথা অনারেবল মেম্বার, কামিং (J. C. Cumming) একটি গোপন ডেমি অফিসিয়াল চিঠির (D. O. no. 8462 P dated 27.11.1913) মাধ্যমে বাংলা দেশের আই. বি. ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেসন ডিপার্টমেণ্টের সুপারিনটেনডেনট হাচিনসনকে (R. H. Sneyd Hutchinson) যথা সময়ে জানিয়ে দেন। চিঠিতে অমরেন্দ্রর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে কামিং বলেন যদিও আপাত দৃষ্টিতে মিশনের সেবা কর্মে সন্দেহ করার মত কোন কিছুর হদিস পাওয়া যায়নি তবুও এটাও সত্যি যে বেশ কিছু সন্দেহজনক ব্যক্তি মিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ত্রাণ কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় মেদিনীপুরের অন্যান্য যে সব সহযোগী দলগুলির সঙ্গে মিশন দুর্গত এলাকায় কাজ করছেন তাদের সকলের উপরেই বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।[৯]

কামিং ১৯১৩ সালে লিখিত ভাবে এই সন্দেহের কথা জানালেও তার ঢের আগে থেকেই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ মিশনের সঙ্গে রাজনীতির গোপন যোগাযোগ আছে বলে আন্দাজ করেছিলেন। তাই সরকারী কর্মচারীগণ যাতে বরিশাল মিশনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পড়েন সে জন্য কর্তৃপক্ষ নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করে আসছিলেন। প্রথমে তাঁরা লিখিত ভাবে অনুমতি চাওয়া সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীগণকে বরিশাল মিশনে যোগ দেওয়ার জন্য দ্বিধাহীন ভাবে কোন অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। দ্বিতীয়ত, তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হল যে এই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি রাজনীতির যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সমিতিতে যোগদানকারী সকল রাজকর্মচারীকেই তার দায় বহন করতে হবে। সব শেষে সমিতির অর্থ বেলুড়ে পাঠনো হলে সেক্ষেত্রে বেলুড়ের সঙ্গে যদি রাজনীতির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তাঁরাও (অর্থাৎ বরিশাল সমিতির সদস্যগণ) তার জন্য দায়ী হতে পারেন বলে প্রকারান্তরে হুমকি দেওয়া হল।

এই সব হুমকিতে ফলও হয়েছিল। বরিশাল ম্যাজিস্ট্রেসির প্রধান করণিক আনন্দ চরণ সেন, যিনি বরিশাল মিশনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, চাকুরি খোয়নোর ভয়ে নির্বাচনের অল্প কয়েকদিন পরেই প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে ইস্তফা দিলেন।[১০] আরও কিছুদিন পরে হীরালাল বসু (বরিশালের জজ কোর্টের অনুবাদক), চন্দ্র কুমার রায় (বরিশাল জজ কোর্টের এ্যাকাউন্টেনট্) এবং গঙ্গাচরণ দাস (উকিল) প্রমুখ অপর তিন ব্যক্তিও

বরিশাল মিশনের সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করলেন।[১১] ইতিপূর্বে বরিশাল মিশনের ১৭ই আগস্ট ১৯১০ তারিখের একটি বিশেষ অধিবেশনে এটি যাতে বেলুড়ের স্বীকৃতি পায় সেই জন্য বেলুড়ে একটি আবেদন পাঠানোর ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবটি গ্রহণ করার মাত্র দশ দিনের মধ্যেই যে হারে সরকারী কর্মচারীগণ এই সমিতি থেকে চাকুরী বাঁচানোর তাগিদে ইস্তফা দিতে শুরু করলেন তাতে আশংকা হল যে সমিতিটি গঠন পর্বের আগেই ভেঙে পড়তে পারে। অতএব ব্যাপারটি অন্তত কিছু দিনের জন্য ধামা চেপে রাখা হল। ২৬শে আগস্ট ১৯১০ তারিখের আর একটি বিশেষ অধিবেশনে অতঃপর এই মর্মে সিদ্ধান্ত করা হল (রেসোলিউসন নং১) যে বেলুড়ের স্বীকৃতি লাভের জন্য বরিশাল মিশন আপাতত কিছুদিনের জন্য কোন আবেদন পাঠাবে না।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সরকারের চাপ এবং হুমকি অগ্রাহ্য করেই শেষ পর্যন্ত বরিশালের রামকৃষ্ণ সমিতি বেলুড়ের কেন্দ্রীয় মিশনের স্বীকৃতি লাভ করে। পূর্বে এর নাম ছিল 'রামকৃষ্ণ সমিতি', কিন্তু ১৯১০ সালের গোড়ার দিকে বেলুড়ের অনুমতিক্রমে এটিকেও 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে অভিহিত করা হয়। পরিশেষে ১৯১১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বরিশাল মিশন বেলুড়ের স্বীকৃতি লাভ করে পুরোপুরি ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়-এরই একটি শাখা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯১১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত বরিশাল মিশনের স্থানীয় কমিটির প্রথম অধিবেশনে গৃহীত প্রথম প্রস্তাবেই এই সংবাদটি আনুষ্ঠানিক ভাবে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

বেলুড়ের অনুমোদন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই বরিশাল মিশন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের তৎপরতা আশ্চর্যজনক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। যত দিন এই অনুমোদন পাওয়া যায়নি ততদিন পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এটিকে বেলুড়ের সঙ্গে পুরোপুরি ভাবে মিশে যাওয়ার (incorporated) সম্ভাবনাটুকু ঠেকিয়ে রাখতে চাইছিলেন। কিন্তু ভবিতব্য যখন নেহাতই অনিবার্যরূপে দেখা দিল তখন সরকারও এটির গতিবিধি সম্পর্কে আরও সতর্ক ভাবে নজরদারি শুরু করে দিলেন। গোয়েন্দা ইন্‌সপেকটর জে. সি. ভৌমিক এ ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষকে আগেই সাবধান করে দিয়ে যথাস্থানে একটি গোপন রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। ১৯১০, ৩রা সেপ্টেম্বরে লিখিত, এই রিপোর্টে ভৌমিক জানান যে বরিশাল মিশনের বর্তমান সেক্রেটারী প্রেমানন্দ দাশগুপ্তের ছোট ভাই জ্ঞানদানন্দ

বর্তমানে আত্মানন্দ নাম গ্রহণ করে বেলুড়েই সন্ন্যাস জীবন যাপন করছেন। এঁদের মাধ্যমে বরিশাল মিশন যে ভাবে বেলুড়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে যাচ্ছে তার ফলে এই নতুন সমিতিটিকেও চোখে চোখে রাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

Lastly I beg to submit that as far as I could, on careful enquiry, find I see that upto date Barisal Ramkrishna Mission are trying to conduct its work in its true colour as a philanthrophic and religious institution apart from all political and other vagaries *but considering its close touch with the main Mission at Belur we should keep a watchful eye on it*,[১২]

ভৌমিকের উপরোক্ত রিপোর্টটি হাতে আসার আগে স্বয়ং রিডও একবার নাথানকে এই মর্মে একটি নোট দিয়েছিলেন। ১২ই আগস্ট ১৯১০ এর এই নোটটিতে রিড লেখেন যে বরিশালের রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনের উপর বিশেষ নজর রাখার দরকার এবং তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বথামকেও ঘটনাটির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন—

When in Barisal I gave definite instructions that the Ramkrishna Misson movement was to be very carefully watched. I have now again called Botham's attention to this.[১৩]

সতর্কতা অবলম্বনের আরও একটি কারণ ঘটেছিল। বেলুড়ের স্বীকৃতি পাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে ১৯১১ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে বরিশালের মিশন প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করার জন্য যে সভা ডাকা হয়েছিল পুলিসের খবর অনুযায়ী সেই সভায় আপাত দৃষ্টিতে কোন রাজনৈতিক প্রচার কর্ম চালানো না হলেও সেখানে কয়েকজন সুপরিচিত রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নেতা হাজির ছিলেন। এঁদের মধ্যে বরিশালের সর্বজন মান্য নেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত, সতীশ চন্দ্র চ্যাটার্জী, শ্রীচরণ সেন প্রমুখ ব্যক্তির উপস্থিতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাখরগঞ্জ পুলিশ ডায়েরির ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯১১ তারিখে এই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় উল্লিখিতও হয়েছিল।

পুলিশ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন মহল থেকে এইভাবে সতর্ক বার্তা পাওয়ার ফলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বথাম যার পর নাই সাবধান হয়ে উঠেছিলেন। ইতিপূর্বে বরিশালের সরকারী কর্মচারীদের মিশনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে কেবল মাত্র আভাসে ইংগিতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এইবারে প্রচ্ছন্ন নির্দেশের পরিবর্তে সরকারের তরফে সুস্পষ্ট আদেশনামা জারি করা হল। কর্মচারীগণ বরিশাল মিশনের সদস্য হিসেবে কোন রকম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকবেন না বলে ইতিপূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন:

I must warn you that you must be careful that this always remains the case whilst you are members of it. This care will be specially necessary if the Barisal Mission associates itself with any other body over whose action you have no control.

একই সঙ্গে বথাম, রিডকেও এই সংবাদ জানিয়েছিলেন

I particularly impressed upon them that by informing me of the affiliation they do not divest themselves of the responsibility of satisfying themselves that the Belur Math is an unobjectionable association.[১৪]

অর্থাৎ, সরকারী কর্মচারী হিসেবে বরিশাল মিশনে যোগ দেওয়ার পর তাঁদের খেয়াল রাখতে হবে যে, তাঁরা বা তাঁদের সংগঠনটি যেন কোন ভাবেই রাজনীতির সঙ্গে বা অন্য কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়েন। বেলুড় মঠের স্বীকৃতি লাভ করার পরেও এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য তাঁদের যে প্রাথমিক দায়িত্ব রয়েছে সেটির কোন ভাবেই ব্যত্যয় হবে না এবং এই সাবধানতার অভাবে যদি তারা কোন সময়ে কোন হাঙ্গামায় অভিযুক্ত হয়ে পড়েন তখন বেলুড়ের স্বীকৃতি লাভ-সম্পর্কিত সংবাদটি তাঁরা আগেই সরকারকে জানিয়ে রেখেছেন বলে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন যুক্তি খাড়া করা যাবে না। মোদ্দা এ-ও আরেক ধরনের হুমকি। এই হুমকি এবং নজরদারি শুরু হয়েছিল ১৯১০ সালে এবং পরবর্তী কয়েক বৎসর যাবৎ এই ধারা অব্যাহত ছিল। অসংখ্য ঘটনা থেকে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথম ক্ষেত্রে পদস্থ রাজপুরুষ স্টিভেনস্ (F.W. Stevens) কর্তৃক ১৯১৩ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে বেটসন-বেল (N. D. Beatson-Bell) এর কাছে লেখা একটি গোপন ডেমি অফিসিয়াল চিঠির (নং ডি. ও. ৭২০ সি) উল্লেখ করা যেতে পারে। এই চিঠিতে বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের উপর সতর্ক প্রহরা মোতায়েন করার জন্য পত্র প্রাপককে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল।[১৫] দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঐ একই বছর, ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কামিং, হাচিনসনকে অপর একটি গোপন ডেমি অফিসিয়াল চিঠির (নং ডি. ও. ৭৫৩৩ পি) মারফত জানান যে, বেলুড় মঠ যে বিপ্লবী প্রচার কাজ চালানোর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে চলেছে সে সম্পর্কে প্রায়ই নানা রকম খবর কর্তৃপক্ষের কানে আসছে। এমতাবস্থায় বেলুড়ের শাখা কেন্দ্র, বরিশাল মিশনও এই রকম কোন কাজে জড়িয়ে পড়ছে কিনা সে বিষয়ে সাবধানে খোঁজ নিয়ে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য তথ্য যেন সত্বর কলকাতাকে জানিয়ে দেওয়া হয়।[১৬] সব শেষে ২রা এপ্রিল ১৯১৪ তারিখে বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী ক্যাসেলস (A. Cassels) সরাসরি টেগার্টকেই একটি গোপন ডি. ও. চিঠি লিখে (ডি. ও. নং ৩৭২৭ পি) অনুরোধ করেন যে তিনি যেন সত্বর বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত অন্যান্য শাখা কেন্দ্র এবং গ্রাম আশ্রমগুলি সম্পর্কে রিপোর্টে সংগ্রহ করে সরকারী কর্তৃপক্ষকে অতি অবশ্য সকল সংবাদ জানিয়ে দেন। টেগার্ট এ ব্যাপারে তদন্তের কাজ বহু আগেই আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর কাজ প্রায় শেষও হয়ে এসেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ছাপানো রিপোর্টটির উপর একবার আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে না নিয়ে সেটি উপর মহলে পেশ করা চলে না। বিশেষ তাঁর হাতে তখন রাজাবাজার বোমা মামলা সংক্রান্ত কেসটিও রয়েছে। অতএব ক্যাসেলস এর উপরোক্ত চিঠির উত্তরে (নং কনফিডেনসিয়েল ৩৯৬৭ আই. বি. তাং ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৪) তিনি জানালেন, With reference to your letter No. 3727 of the 2nd instant on the subject of my report on the Ramkrishna Mission, I hope to have the note ready by next week. I have been busy with the Raja Bazar and other cases since my return from Delhi and have not had time to attened to this.[১৭] এর কয়েক দিন পরেই ২২শে এপ্রিল তারিখে টেগার্ট "দি রামকৃষ্ণ মিশন" শীর্ষক গোপন মুদ্রিত রিপোর্টটি

(তথা কথিত রেড বুক) সরকারের নিকট জমা দেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এই রিপোর্ট্টি যথা সম্ভব অনুবাদ করে পাঠক সমাজের কাছে পেশ করা হল।

তথ্যসূত্র

১ Govt. of Bengal, Political Deptt, Political Branch, Confidential. file no. 269 (1-2)/1913.

২ ঐ

৩ ঐ—Extract from the report of the Intelligence Branch, Criminal Investigation Deptt. Bengal, for the week ending the 13th August, 1913 এই সকল সদস্যরা হলেন :

কার্য নির্বাহক

সভাপতি : জগদীশ চন্দ্র মুখার্জী, প্রধান শিক্ষক, ব্রজমোহন ইনস্টিটিউসন
উপ-সভাপতি : গণেশ চন্দ্র দাস, সরকারী উকিল
কোষাধ্যক্ষ : রাজেন্দ্র লাল ব্যানার্জী, সরকারী কনিষ্ঠ উকিল
প্রধান পরিদর্শক : পণ্ডিত কৈলাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, শিক্ষক, ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন
সচিব : নলিনী কান্ত কর, উকিল
সহকারী সচিব : রাখাল চন্দ্র ঘোষ, ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের করণিক

সদস্যগণ

সত্যভূষণ দাস, তালুকদার, বরিশাল
প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত, নায়েব নাজির, জেলা আদালত
দেবেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী, কালেকটরেট অফিসের করণিক
উমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, মিঃ ব্রাউন (Mr. Brown)-এর অফিসের করণিক
মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, ডিমনস্ট্রেটর, ব্রজমোহন কলেজ
যতীশ চন্দ্র ঘোষ, উকিল, বরিশাল
সুরেন্দ্র কুমার সেন, ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের করণিক
অক্ষয় কুমার ব্যানার্জী, কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-এর করণিক
গোপাল লাল ব্যনার্জী, সরকারী উকিলের করণিক
অম্বিকা নাথ দাশগুপ্ত, কবিরাজ, বরিশাল

৪ বরিশালের রামকৃষ্ণ মিশন ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯১১ তারিখে বেলুড়ের যথাবিহিত স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু ১৯১০ সালের আগে এটি রামকৃষ্ণ সমিতি নামেই পরিচিত ছিল।

৫ Govt. of Eastern Bengal and Assam, Political Branch, Confidental. file no. 372/1910.

৬ ঐ

৭ Extract from Intelligence Branch Weekly Search Report dt. 19-11-1913 দ্রষ্টব্য Govt. of Bengal, Political Deptt., Political Branch, Confidential, file no. 269 (3-7)/1913.

৮ টীকা নং ৫ এর অনুরূপ।

৯ টীকা নং ৭ এর অনুরূপ।

১০ Bakharganj I. B. Diary, para 2579 dt 23-7-1910. দ্রঃ টীকা নং ৫ এর অনুরূপ।

১১ Proceedings of an extra-ordinary general meeting held in the Mission home (Barisal) on the 26th August 1910. Chairman, Babu Satya Bhusan Das, Resolution II. দ্রঃ টীকা নং ৫ এর অনুরূপ।

১২ ঐ। উদ্ধৃতাংশের শেষটুকু বর্তমান লেখক কর্তৃক বাঁকা অক্ষরে লেখা হয়েছে।

১৩ ঐ

১৪ Letter from A. W. Botham to the Hon'ble Mr. W.G. Reid, I. C. S., no. D. O. 901 C dt 13. 3. 1911. দ্রঃ ঐ।

১৫ টীকা নং ১ এর অনুরূপ।

১৬ ঐ

১৭ Govt. of Bengal, Political Deptt. Political Branch, Confidential, file no 116 (1—6)/1914.

তৃতীয় অধ্যায়

টেগার্টের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন

[চার্লস অগস্টাস টেগার্ট বাংলা দেশের ইতিহাসে একটি সুপরিচিত নাম। বিপ্লববাদী কর্মীদের দমন অভিযানে ইনি বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত ইংরাজের পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় নেতৃত্ব দান করেন। বাংলাদেশের বিপ্লব কর্মীরা তাঁর জীবন নাশের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই ইনি আশ্চর্য ভাবে রক্ষা পেয়ে যান। ১৯১৪ সালে ইনি বাংলা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে (Inteligence Branch.) স্পেশাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদে চাকুরীরত অবস্থায় তিনি দি রামকৃষ্ণ মিশন নামে ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ছাপান রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলেন। মূল রিপোর্টটি যথা সম্ভব অনুবাদ করে এখানে তুলে ধরা হল।]

[গোপনীয়]

হিন্দু সন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী, তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার ফলে এগুলি সম্প্রতি ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমবিকাশ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত যে বিপ্লবী দলটি বাংলা দেশের যুব সম্প্রাদায়কে আলোড়িত করেছে এবং যার বিষময় প্রভাব পাঞ্জাব এবং ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলিতেও বিপজ্জনক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলির সঙ্গে মিশন ও তার অনুগামীদের যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের উৎপত্তি ও প্রসার এবং উপরে যেমন বলা হয়েছে, বিশেষ করে এর রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রতিবেদনটি রচিত হয়েছে।

১

শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলে নেওয়া দরকার।

প্রথম জীবনে গঙ্গাধর (আসলে গদাধর। টেগার্টের এই রকম অনেক মারাত্মক ভুল পরেও লক্ষ্য করা যাবে) চ্যাটার্জী নামে অভিহিত, রামকৃষ্ণ ১৮৩৩ সালের কোন এক সময়ে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা মাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিকগণের মতে, একদা গয়াতে তীর্থ যাত্রা করার পথে তাঁর বাবার কাছে স্বয়ং বিষ্ণু স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে অচিরেই তাব ঘরে জন্ম নেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এই জন্যই বিষ্ণুর আর এক নাম গঙ্গাধর হিসেবে তাঁকে প্রথম জীবনে ডাকা হত।

শোনা যায় যে বাল্যকাল থেকে রামকৃষ্ণ ধর্ম বিষয়েই সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ বোধ করতেন। গাঁয়ের স্কুলে পাঠ নেওয়া ছাড়া বেশী লেখা পড়া তিনি শেখেননি। কিন্তু তাঁর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। পুরী যাওয়ার পথে তাঁর বসত গ্রামের উপর দিয়ে যে সকল সন্ন্যাসী এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যাতায়াত করতেন তাঁদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৭।১৮ বছর বয়সের রামকৃষ্ণ তাঁর বড় ভাই রামকুমারের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন।

১৮৫৫ সালে রাণী রাসমনি নামে একজন ধনী বাঙালী মহিলা কলকাতা থেকে চার মাইল দূরে গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণ করেন। রামকৃষ্ণের বড় ভাই এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত হন এবং অল্প কিছু দিন পরে রামকৃষ্ণও এখানে সহকারী পুরোহিতের কাজ পেয়ে যান।

এই সময় তাঁর ভক্তি ভাবের উচ্ছ্বাস দেখে অনেকেই রামকৃষ্ণের প্রকৃতিস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। শোনা যায়, যে নিয়মিত পূজার্চনার পর তিনি প্রায়ই দেবী কালী মূর্তির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তবগান করে চলতেন এবং বাহ্যজ্ঞান রহিত না হওয়া পর্যন্ত বালকের মত এক টানা প্রার্থনা করে যেতেন। কোন কোন দিন মা'কে যেমন পূর্ণ রূপে দেখতে চাইতেন তেমন

ভাবে দেখতে না পেয়ে তিনি এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা শুধু কেঁদেই চলতেন। তাঁর আত্মীয়েরা ভাবলেন যে বিয়ে হলে এবং স্ত্রী পরিবারের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপলে তাঁর কল্পনা প্রবণতা আপনাতেই সংযত হয়ে আসবে। তাই দেশের গ্রামে ফিরিয়ে এনে তাঁকে ২৪-পরগণার জয়রামপুরের রামকমল মুখার্জীর মেয়ে সারদামনির সঙ্গে ১৮৫৯ সালে বিয়ে দেওয়া হল।[২]

সারদামণি এখনও জীবিত আছেন। বিয়ের সময় তাঁর নিজের বয়স ছিল মাত্র ছয় এবং তাঁর স্বামীর বয়স ছাব্বিশ।[৩] বিয়ের পর রামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরের মন্দির উদ্যানে ফিরে আসেন এবং শোনা যায় যে সেই সময় থেকে তিনি ধর্মকর্ম ও ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। আত্মীয়-স্বজনের বিশ্বাস অনুযায়ী এই সময় তাঁর ধর্মোচ্ছ্বাস না কমে বরং হাজারগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ধর্মব্যাপারে এই রকম মানসিক অবস্থায় তাঁকে দিয়ে আর মন্দিরের কাজ চালানো যাবে না, এই ভেবে মন্দির কর্তৃপক্ষ এই সময় তাঁর জায়গায় আর একজন পুরোহিত নিয়োগ করলেন।

কর্মজীবনের এই সন্ধিক্ষণে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে রামকৃষ্ণের একজন অনুগামী এই সময় মন্তব্য করেন—"বিয়েটা শুধু নাম কা ওয়াস্তে। এত দিন তিনি শুধু মা, মা করে দিবারাত্র ডেকে গিয়েছেন। আর এখন তিনি স্রেফ কাষ্ঠ পুত্তলী বা প্রস্তরবৎ স্থাণু। এখন থেকে কখনো তাঁকে অপ্রকৃতস্থ চিত্ত মানুষ আবার কখনো বা বালকের মত আচরণ করতে দেখা যায়। বিষয়ী লোকের নজরের আড়ালে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। ভগবানের প্রতি যাদের ভালবাসা নেই তাদের তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না, এমন কি ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন কথা তিনি শুনতেই চাইতেন না। 'মা! আমার জগজ্জননী মা!'—এই ছিল তাঁর সে সময়কার, একটি মাত্র বিরামহীন জপের মন্ত্র।"

ভক্ত হিসাবে রামকৃষ্ণের খ্যাতি এই সময় বাংলা দেশের সর্বত্র দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক পণ্ডিত ও তাঁদের শিষ্যগণ রামকৃষ্ণকে দেখতে আসতেন এবং তাঁরা অনেকেই তাঁকে নদীয়ার সিদ্ধপুরুষ চৈতন্যের অবতার বলে বিশ্বাস করেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সপার্ষদ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং রামকৃষ্ণও বহুবার কেশব চন্দ্র সেনের বাড়িতে হাজির হয়ে ফিরতি সাক্ষাৎ করে আসতেন। জনশ্রুতি আছে যে এই সব সাক্ষাৎকার সভায় রামকৃষ্ণ বহুক্ষণ ধরে ভগবৎ প্রসঙ্গ

আলোচনা করতেন এবং তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর মুখ নিঃসৃত সেই সব জ্ঞানের বাণী গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনত।

জীবনের শেষ ভাগে রামকৃষ্ণ যেন নিজেকেই ভগবানের অবতার রূপে অনুভব করতেন এবং তাঁর শিষ্যরা এখন তাঁকে সেই ভাবেই পূজা করে। তাঁর দৃষ্টি ক্রমশ আরো প্রসারিত হতে থাকে এবং তাঁর সমাধি বা বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থা আরো দীর্ঘ সময় স্থায়ী হতে লাগল। তাঁর শিষ্যরাও নাকি অনেক বার তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এই রকম বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হতেন। এই রকম স্পষ্টত সম্মোহনী শক্তির ফলে রামকৃষ্ণ অচিরেই ঐশী শক্তির অধিকারী বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

লোকে বলে যে, যে কোন ব্যক্তির শরীরকে স্পর্শ করেই তার চিন্তা ভাবনা পাল্টে দেওয়ার মত অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। স্পর্শলাভ করা মাত্রই কারো কারো সমাধি দশা হত আর সেই অবস্থায় তাঁরা বাহ্য পৃথিবীর সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে দেব দেবীর দর্শন লাভ করতে পারতেন।

দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি যোগ বা দৈহিক সংযম অভ্যাস করতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এর ফলে মানুষ তাঁকেই পেতে পারে যাঁকে সহজে লাভ করা যায়না এবং যাঁকে একবার পাওয়া হলে মানুষ আর কখনো তার ব্যক্তি-চৈতন্যের জগতে ফিরে আসতে ইচ্ছুক হবেনা। এই রকম সাধনার ফলে তিনি মাঝে মাঝে অন্তত ছয় মাস ধরে ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে একাত্ম হয়ে যেতেন। এই ভাবে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে তাঁর দেহ ভেঙে পড়েছিল। ১৮৮৬ সালে, দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়িতে রামকৃষ্ণের শেষ বারের মত চৈতন্য লুপ্তি বা সমাধি হয় এবং সে যাত্রা আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি। নিকটস্থ শ্মশান ঘাটে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। এই জায়গার ঠিক বিপরীত দিকে নদীর অপর পারে বর্তমানের বেলুড় মঠ। জীবনের শেষ কয়টি বছরে তাঁর স্ত্রী সারদামণি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সর্বদা তাঁর পাশে থেকে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সেবা করে গিয়েছেন।

কেশবচন্দ্র সেন এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ তাঁর দুই সমকালীন খ্যাতনামা ব্যক্তি আলাদা সম্প্রদায় ও ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ এঁদের মত কোন নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন নি। তিনি কেবল ভারতের সনাতন বেদাশ্রয়ী ধর্মের প্রচার করেছিলেন। তবে রামকৃষ্ণ একাই যে কেবল ধর্ম প্রচার বা সন্ন্যাসের জীবন গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা কোন ভাবেই বলা চলেনা।

অধ্যাপক ম্যাক্স মূলার তাঁর সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন "রামকৃষ্ণকে কোন অর্থেই একজন মৌলিক চিন্তানায়ক, একটি নতুন মতবাদের আবিষ্কর্তা বা জগৎ ব্যাপারের এক নতুন ব্যাখ্যাকার হিসাবে গণ্য করা চলে না। কিন্তু তিনি এমন অনেক কিছু উপলব্ধি করেছিলেন যা অন্য কেউ পারেনি। যেখানে ঈশ্বরের সাড়া কোন ভাবেই মেলার নয় সেখানেও তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন। তিনি কবি, উচ্ছ্বাসময়, বা চাই কি তাঁকে স্বপ্নচারী মানুষও বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর এই স্বপ্নগুলি বাঁচিয়ে রাখার মত, এবং সেগুলি সহজেই আমাদের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। রামকৃষ্ণ কোন দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করেন নি। তিনি কেবল সংক্ষিপ্ত কিছু বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন—হয়ত বক্তা তখন স্বপ্ন বা সমাধি দশায় থাকতেন কিংবা হয়ত সে সময় তাঁর হুঁসও থাকত না, তবু লোকে সেই সব বাণী শুনতে আসত। আমরা যেটুকু জানতে পারি তা থেকে এটা স্পষ্টত পরিষ্কার যে, শ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রবল ক্ষমতা ও দীর্ঘকাল ব্যাপী কৃচ্ছ্র সাধণার অভ্যাস প্রভৃতির ফলে তিনি স্নায়বিক উত্তেজনার এমন চরমে উঠে যেতে পারতেন যে, সে সময় যে কোন মুহূর্তে তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারতেন বা তথা কথিত সমাধি বা অচৈতন্য দশাও প্রাপ্ত হতেন। এক এক সময় রামকৃষ্ণকে এক গভীর ঘুমে এত দীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখা যেত যে, তাঁর বন্ধুরা সভয়ে চিন্তা করতেন যে তিনি বুঝি আর কোনদিন জেগে উঠবেন না এবং তাঁর মৃত্যুর সময় ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। হঠাৎ তাঁর সংজ্ঞালোপ হল এবং আর তাঁর জ্ঞান ফিরল না। কিন্তু মৃত্যুর শাসন শুধু তাঁর শ্বাস বায়ু এবং দেহের উপরেই স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর সত্তা, যা আর তাঁর ছিলনা, তা অচিরেই ব্রহ্ম সংস্পর্শ ফিরে পেল। প্রপঞ্চময় জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আকারময় দেহের অস্তিত্ব ও আমিত্বের কুহেলি ভেদ করে, তিনি সেই শাশ্বত, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বা অনন্ত আত্মার সঙ্গে লীন হয়ে গেলেন।"

ইতিপূর্বে যেমন বলা হয়েছে, সেই রকম উপরোক্ত লেখকও স্বীকার করেন যে, রাককৃষ্ণ খুবই সাধারণ স্তরের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত অথবা ইংরাজী বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকলেও তিনি কিন্তু দর্শন বা জ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে প্রভেদটা খুব সহজেই বুঝতে পারতেন এবং তিনি স্বয়ং জ্ঞানী অপেক্ষা বরং বেশী করে ভক্ত ও দেবীর উপাসক হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

২
বেলুড় মঠ এবং মঠের প্রতিষ্ঠাতা

এই রকম এক জন মানুষের জীবনী ও বাণী তাঁর একান্ত অনুরক্ত এবং প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ অচিরেই ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমের পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী তাঁর এই সকল শিষ্যবৃন্দ বর্তমানে একটি ক্রমবর্দ্ধমান সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পারিবারিক নাম নরেন্দ্র নাথ দত্ত। সম্ভবত ১৮৮১ সাল নাগাদ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ছিলেন, কলকাতা হাই-কোর্টে এ্যাটর্নীর পেশায় নিযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ দত্ত নামক পরলোকগত জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোকের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৮৬৩ সালে কলকাতা শহরে নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার স্কটল্যাণ্ড মিশন চার্চের স্কুলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং কালক্রমে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন।

তাঁর দু জন ভাই ছিল। প্রথম জন ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ছিলেন কুখ্যাত 'যুগান্তর' কাগজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই কাগজটিই বাংলার যুব মানসে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অঙ্কুর বপন করে। অবশ্য সরকার ১৯০৮ সালের মধ্যেই এগুলি দমন করেন। রাজদ্রোহের দায়ে ভূপেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম অভিযুক্ত হন এবং এই জন্য ১৯০৭ সালে তিনি এক বছরের মেয়াদে কারাদণ্ড লাভ করেন। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে তিনি মুক্তি লাভ করার পর কিছুকাল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠে আত্মগোপন করে থাকেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ঐ বছরের আগস্ট মাসে নিউ ইয়র্কে এসে উপস্থিত হন। তিনি নিউ ইয়র্কের 'ভারত ভবন' এ এসে ওঠেন এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান সমালোচক মাইরন ফেল্‌পস (Myron Phelps)[৪] এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত এবং বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযুক্ত জনৈক ভারতীয়, গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসারের কাছে কবুল করেন যে, তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসার পথে প্যারিসে কৃষ্ণ বর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে তিনি জেনেছিলেন যে কৃষ্ণ বর্মার বিশেষ আস্থা ভাজন ভূপেন্দ্রনাথ বর্তমানে তাঁর কাছ থেকে বিশেষ রকম আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন। এ সব কথা বাদ দিলেও এই মত রিপোর্ট আছে যে, এই ব্যক্তিটিই সম্ভবত বাংলার বিপ্লবী দলের সব চেয়ে বিপজ্জনক নেতৃবৃন্দের অন্যতম এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা

থাকায় তিনি বিপ্লবী দলের গোঁড়া সদস্যদের কাছ থেকে এক ধরনের ধর্মীয় সম্মান লাভ করেছিলেন।

বিবেকানন্দের অপর ভাই মহেন্দ্র বর্তমানে কলকাতায় বাস করছেন। নিজস্ব আয় বিশিষ্ট এই ভদ্রলোকটি ইউরোপ, মিশর এবং পারস্য অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করেন। কলকাতায় তাঁর বাড়িতে মিশনের একটি কেন্দ্র হয়েছে। ১৯০৯ সালে অপরাধ বিভাগের (Criminal Intelligence) অধিকর্তা (Director) রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে যে প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন সেখানে স্বামী-বিবেকানন্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করার পর, ১৮৯২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে সময় তিনি কাথিয়াবাড় এলাকার বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করছিলেন এবং সেখানকার স্থানীয় রাজারা তাঁকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর ধর্মীয় বক্তৃতাগুলি শ্রোতাদের মনে বড় একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি, কিন্তু এটা লক্ষ্য করা গেছে যে তিনি রাজনীতি ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালের গোড়ার দিকে মাদ্রাজ যান। সেই সময় চিকাগোতে ধর্মসভা আয়োজন করার প্রস্তাব চলছিল। তাঁর বক্তৃতাগুলি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাড়া জাগায় এবং এই কারণে চিকাগোর ঐ ধর্মসভায় হিন্দু ধর্মের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য মাদ্রাজ নিবাসী হিন্দুগণ তাঁকেই মনোনীত করেন। তাঁর ব্যয় নির্বাহের জন্য হিন্দু সম্প্রদায় অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগী হন। মহীশূর এবং রামনাদের মহারাজগণ এই উদ্দেশ্যে চাঁদা দিয়েছিলেন।

১৮৯৩ সালের মে মাসে চিকাগোতে পৌঁছে স্বামীজী শুনতে পেলেন যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হবে না। এই অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে বন্ধুরা এগিয়ে এসে তাঁর ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৩-র সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ধর্ম সম্মেলনে তিনি বিপুল ভাবে সাফল্য লাভ করেন এবং এখন থেকে তিনি আমেরিকাতে বেদান্ত ধর্মের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃত হলেন। ১৮৯৪-৯৫ এর মধ্যে তাঁকে সে দেশ ব্যাপক ভাবে পরিভ্রমণ করতে দেখা যায় এবং এই সময় তিনি যথেষ্ট ভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতেও সক্ষম হন। নিউ ইয়র্কে তিনি কয়েক মাস ধরে রোজই অবৈতনিক ক্লাস নিতেন। মোট কথা তাঁর বিদেশ যাত্রা অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। ১৮৯৫ সালে এবং তার অগের বছরে বিবেকানন্দ যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার জের হিসেবে ঐ

বছর সেই শহরে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকা থেকে বিবেকানন্দ ফিরে যাওয়ার পর, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ তথা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে এই সোসাইটির কাজ চালানোর জন্য ১৮৯৬ সালে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়। ইনি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না, কেননা তিনি ১৮৯৮ সালেই ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে লণ্ডনে বক্তৃতারত কলকাতার কালীচন্দ্র চন্দ্র তথা স্বামী অভেদানন্দকে বেদান্ত সোসাইটির তরফে নিউ ইয়র্কে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। তিনি নিউ ইয়র্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলের সর্বত্র বক্তৃতা দান করেন। তিনি ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বেদান্ত সোসাইটিকে সমিতি আকারে সংগঠিত করেন। অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা জানান যে, পরবর্তী বছরগুলিতে অভেদানন্দের বক্তৃতা সভায় বিপুল সংখ্যক শ্রোতার সমাবেশ হত। ১৯০৪ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সেণ্ট লুই এর জগৎ মেলায় ("World's Fair") অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে বেদান্ত সোসাইটিকে তাঁরই উদ্যোগে সেখানে উপস্থাপিত করা হলে, আমেরিকায় অভেদানন্দের উপদেশাবলী সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ১৯০৫ সালে ব্রুকলিন-এ একটি যোগকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং গোটা মরশুম ধরেই নিয়ম করে নানা স্থানে সাপ্তাহিক সভার আয়োজন করা হত। ঐ বছর ওয়াশিংটন-এও একটি শাখা কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করা হয়।

হুগলি জেলা নিবাসী হরিপদ চ্যাটার্জি তথা স্বামী বোধানন্দের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ সালের মে মাসে ভারতবর্ষের পথে পাড়ি দেন। ঐ বছরের মে মাসে স্বামী বোধানন্দ, স্বামী পরমানন্দকে তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য সঙ্গে নিয়ে নিউ ইয়র্ক-এ উপস্থিত হন।

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে সোসাইটি, ১৩৫ নং ওয়েস্ট এইট্টিয়েথ ষ্ট্রীটের বাড়িটি কিনে সেখানে উঠে আসে এবং তদবধি এই প্রতিষ্ঠান সেখানেই রয়ে গিয়েছে। শহরের কেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত এই বাড়িতে বক্তৃতা দেওয়া, ক্লাস নেওয়া, লাইব্রেরী করা বা ছাপাখানার কাজ চালানোর মত অনেকগুলি ঘর ছিল। এ ছাড়া এখানে ভারপ্রাপ্ত স্বামীজীদের থাকার মত যথোপযুক্ত আবাসগৃহও ছিল।

১৯০৮ সালে অভেদানন্দ পুনর্বার লণ্ডনে এসে সেখানে ছয়মাস ধরে বক্তৃতা

দান করেন। এখানে তিনি বেদান্ত সোসাইটির আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি প্যারিস-এও বক্তৃতা দেন এবং অল্প-বিস্তর সাফল্যও অর্জন করেন।

অপরাধ বিভাগের অধিকর্তার মতে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি তার প্রকাশনা বিভাগের উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এটি প্রায় চল্লিশ খানি বই প্রকাশ করে। বেদ ও প্রাচ্য দেশের অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়াও, এই সংস্থা স্বামীজীদের বিভিন্ন বক্তৃতাগুলি সঙ্কলন করে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে 'ব্রহ্মবাদিন' এবং 'এ্যাওয়েকেণ্ড ইণ্ডিয়া' (Awakened India) নামক দুটি শীর্ষস্থানীয় বেদান্ত পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলি বিক্রয় ও প্রচারের জন্য সোসাইটি একাধিক কেন্দ্রও স্থাপন করেছিল।

উপরে উল্লিখিত নিউ ইয়র্ক, ব্রুকলিন এবং ওয়াশিংটন কেন্দ্রগুলি ছাড়াও, ১৯০৬ সালে সোসাইটি, ক্যালিফোর্নিয়ার স্যানফ্রান্সিসকো ও লস এঞ্জেলস এবং ভ্যানকুভার-এও কয়েকটি নতুন শাখা কেন্দ্র উদ্বোধন করে। কলকাতার নন্দন-বাগান অঞ্চলের অধিবাসী সারদা কুমার মিত্র তথা স্বামী ত্রিগুণতীর্থ স্যান-ফ্রান্সিসকো কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান করতেন।[৫] তিনি অদ্যাবধি ঐ কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন। ১৯০৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতেও একটি যোগকেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং গুরুদাস ব্রহ্মচারী নামে যিনি আত্মপরিচয় দিতেন সেই মিঃ হেলবম (Mr. Helbom) এটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে বহু ছাত্র এবং স্বামীজীরা বছরের এক সময়ে যোগাভ্যাস করবার জন্য এই কেন্দ্রে এসে সমবেত হন। অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা মনে করেন যে, ১৯০৮ সালে মিঃ হেডলম (Mr. Heydlom) নামে পরিচিত যে আমেরিকান ভদ্রলোকটিকে মায়াবতীতে বসবাস করতে দেখা গিয়েছিল, তিনিই ছিলেন এই যোগকেন্দ্রের পরিচালক। স্বামী অভেদানন্দর অসংখ্য উৎসাহী মহিলা অনুরাগীদের একজন ক্যালিফোর্নিয়ার এই শান্তি আশ্রমটির জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন। অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা লিখেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং উপদেশগুলির সমুদয় আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য সত্ত্বেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বেদান্ত ধর্মের কতিপয় ভণ্ড প্রচারক এবং এমন কি যাঁরা যথার্থ সন্ন্যাসী হিসাবে স্বীকৃতি পেরেছিলেন, তাঁরাও পশ্চিমের মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পাওয়া যাবে জেনেই, ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই সব কাজের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন।"

আমেরিকায় অবস্থান কালে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৪-৯৫ সালে ডেট্রয়, বোস্টন, হার্ভার্ড এবং চিকাগো পরিভ্রমণ করেন।

আমেরিকায় তাঁর দুজন শিষ্যকে মিশনের স্বামী হিসেবে বিধিমত দীক্ষা দেওয়া হয়। এঁরা হলেন—

(১) মারী লুইজি (Marie Lousie) তথা স্বামী অভয়ানন্দ নামক জনৈকা ফরাসী ভদ্রমহিলা, এবং (২) লিও স্যণ্ড্সবারি (Leon Sandsbury) তথা স্বামী কৃপানন্দ নামক একজন রাশিয়ান ইহুদী।

১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডের পথে যাত্রা করেন এবং ইংল্যাণ্ডের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সদস্য মিঃ স্টার্ডি'র (Mr. Sterdy) সঙ্গে একত্র বসবাস করেন। এই স্থানেও তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজ বিপুল ভাবে সাফল্য লাভ করে। এই সময়ে তিনি অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার (Max Muller) এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

নীতি সম্মেলনে (Ethical Conference) যোগ দেওয়ার জন্য অতঃপর স্বামীজী ইংল্যাণ্ড থেকে জুরিখ এ এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনি জার্মান বৈদান্তিক, অধ্যাপক ড্যসেন (Deussen) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কিয়েল এ আসেন। লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার সময় ড্যসেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর অগণিত অনুরাগীবৃন্দ তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য পিকডেলির জলরঙ শিল্পীদের ভবনে (Institute of Painters in Water Colours) আয়োজিত একটি বিদ্বৎসভায় তাঁর উদ্দেশ্যে একটি মনোজ্ঞ অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ, শ্রী ও শ্রীমতী সেভিয়ার (Sevier) নামক দুজন আমেরিকান এবং গডউইন (Godwin) নামক অপর একজন ইংরাজ ভদ্রলোক সমভিব্যহারে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। এঁরা সকলেই তাঁর শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে তাঁকে কলম্বোতে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হয় এবং ঐ মাসের ২৬ তারিখে তিনি রামনাদের রাজা কর্তৃক পম্বনে মহা সমারোহে অভ্যর্থিত হন। ১৮৯৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং অন্যান্যরা তাঁকে মাদ্রাজ শহরেও সোৎসাহ অভ্যর্থনা জানান। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং মিঃ হ্যারিসন (Harrison) নামে সম্ভবত জনৈক বৌদ্ধ, কলম্বোর সভায় উপস্থিত ছিলেন বলে মনে হয়।

১৮৯৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় পৌছলে তাঁকে বিপুল উদ্দীপনা সহকারে অভ্যর্থনা করা হয়। রাজা বিনয়-কৃষ্ণ দেব এর সভাপতিত্বে আহুত একটি বিশাল জনসভায় তাঁর উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ পাঠ করা হয়। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, তিনি ফিরে আসার পর তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্য যে সব আয়োজন করা হয়েছিল তাতে জাতীয় কংগ্রেসের অনেকেই যোগদান করেন। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে স্বামীজীর একটি বক্তৃতা সভায় কংগ্রেসের নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন—মাননীয় শ্রীপি. আনন্দ চার্লু, মাননীয় শ্রীএ. এম. বসু, মাননীয় শ্রীগুরুপ্রসাদ সেন, শ্রীজে. ঘোষাল, শ্রীএন. এন. ঘোষ, এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর' (কলকাতা) পত্রিকার সত্বা-ধিকারী শ্রীনরেন্দ্র নাথ সেন।

১৮৯৭ সালের মে মাসে, মঠের অপরাপর পাঁচজন সন্ন্যাসী সহ, স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি লক্ষ্ণৌ, আলমোড়া, দেরাদুন, নৈনিতাল, বেরিলি, শিয়ালকোট, লাহোর, অমৃতসর এবং অন্যান্য জায়গাগুলি পরিভ্রমণ করেন।

ফিরে আসার পর (১৮৯৮ সালে) স্বামী বিবেকানন্দ হাওড়া জিলার গঙ্গা-তীরবর্তী বেলুড়ে এসে স্থায়ী ভাবে বাস করতে শুরু করেন এবং বেদান্ত ধর্মের বাস্তব দিকটি প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে এইবারে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। একটি দোতালা বাড়ি বানিয়ে শিষ্যদের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হল—এখানেই তাঁরা বেদান্ত দর্শনের পাঠ গ্রহণ করতেন। পূর্বে উল্লিখিত স্বামী অভেদানন্দ তথা কালীচরণ চন্দ্রের পিতা বাবু রসিক লাল চন্দ্র, একদা এই বাড়ি ও তার সংলগ্ন জমি সমূহের মালিক ছিলেন।

১৮৯৮ সালে চারজন বাঙালী শিষ্য ও চারজন ইংরাজ ও আমেরিকান মহিলা সহ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বারের জন্য উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। শেষোক্ত দলে ছিলেন মিঃ পিচার (Mr. Pitcher) এবং কুমারী নোবল, (Miss Noble) যিনি ভগ্নী নিবেদিতা নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। এঁর বিস্তৃত জীবনেতিহাস পরে বর্ণিত হয়েছে। এঁরা সকলে নৈনিতাল, কাশ্মীর এবং আলমোড়া পরিদর্শন করে ঐ বছরের অক্টোবর মাসেই আবার কলকাতায় ফিরে আসেন।

এই সময় বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি বিশ্রামের জন্য দেওঘরে এসে উপস্থিত হন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টায় তিনি অল্প কিছু দিন পরেই লণ্ডনের

দিকে যাত্রা করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন কুমারী নোবল এবং কলকাতার বোসপাড়ার বাসিন্দা হরিপদ চ্যাটার্জী তথা স্বামী তুরীয়ানন্দ।

জানা গিয়েছে যে ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, অল্প কিছু দিন ইংল্যণ্ডে বাস করার পর স্বামীজী আবার আমেরিকায় চলে আসেন। নিউ ইয়র্ক শহরে তাঁর অনুরাগীগণ তাঁকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা জানান। এইখানে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার পর তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যাত্রা করেন। ক্যালিফোর্নিয়াবাসী অগণিত বন্ধুদের একজন মিশনের সাহায্যার্থে এই সময় তাঁকে ১৬০ একর জমি দান করেন।

ধর্মীয় মহাসম্মেলনের তরফে প্যারিস প্রদর্শনীতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, আমন্ত্রণ পাওয়ায় পর তিনি ফ্রান্সের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন।

১৯০০ সালের শেষাশেষি বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য আবারো ভাঙতে শুরু করে এবং তিনি সকল প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯০১ সালের মার্চ মাসে তিনি ঢাকা যান এবং সেখান থেকে পরের মাসে শিলং এ এসে পৌছলে সেখানকার চীফ কমিশনার স্যার হেনরী কটন্ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি বেলুড়ে নিরিবিলিতে বাস করছিলেন। এখানেই ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই, ৩৯ বছর বয়সে আকস্মিক ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি ভারতীয় যুব দলকে প্রতি বছরেই কিছু কিছু সংখ্যায় জাপানে পাঠানোর প্রয়োজন উল্লেখ করে তাদের বিচ্ছিন্নতা এবং জাত বাঁচানোর আগ্রহ যা তাদের সমুদ্র যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করে, সেই সব গোঁড়ামির নিন্দা করেন।

মঠের আবাসিক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের কাছ থেকে ধর্মোপদেশ শুনবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীগণ, জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত বেলুড় মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রতিদিন সমবেত হতেন। প্রাঙ্গণের যে অংশে ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শেষ কৃত্য নিষ্পন্ন হয়েছিল সেইখানে একটি মন্দির নির্মিত হয়। এরই ঠিক বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরে বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ক্ষেত্র। মঠের দুটি ঘরে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পোষাক, বিছানা, রন্ধনসামগ্রী এবং তাঁদের মূল রচনাবলীর কিয়দংশ, প্রভৃতি ব্যক্তিগত সামগ্রী সংরক্ষিত আছে। মঠের একটি নিজস্ব উপসনাগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বস্ত শিষ্যগণ নিত্য তাঁর আরাধনা করে থাকেন।

৩

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতবর্ষের অস্থিরতা

ভারতবর্ষের বিপ্লব আন্দোলন বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা মন্তব্য করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলির মধ্যে এমন কিছু ছিল না যেগুলি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত বলে মনে করা যেতে পারে। তিনি নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর তাবৎ ধর্মগুলির পরিপূরক হিসেবে হিন্দু ধর্মকে স্বকীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই জন্য হিন্দুদের উপর ক্রিশ্চানদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ঘটনাকে তিনি নিজের ধর্ম চেতনার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না।

এই প্রশ্নটি আলোচনা প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে, পূর্বে উল্লিখিত, ভ্রাতা ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের কারণে স্বামী বিবেকানন্দের পরিবার রাজদ্রোহে কলুষিত হয়ে উঠেছিল। দুই ভাইয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক—একটি অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা যা অচিরেই বিদেশীর অধীনতা থেকে মুক্তি লাভে সমর্থ হবে। আইনানুগ ভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে ভূপেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে দেশের প্রাচীন ইতিহাসের আদর্শ এবং বেদান্ত দর্শনের শিক্ষা অনুযায়ী বিবেকানন্দ শুধু দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। বেদান্ত দর্শনে আছে মানুষে মানুষে সাম্যের শিক্ষা এবং এর কোথাও নেই জাতি বৈষম্যের বিধান, যা পরবর্তীকালে প্রাচীরের মত ভারতবাসীকে এমনভাবে ঐক্যহীন ও দ্বিধাবিভক্ত করে তুলেছিল এবং যার ফলে ঐক্যবদ্ধ মুষ্টিমেয় ইংরাজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্বামীজীর উপদেশাবলীর এই বিশেষ তাৎপর্যটুকু তাঁর কিছু কিছু বক্তৃতা ও রচনার মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এখানে সেগুলি উল্লেখ করলে সুবিধা হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে তাঁকে একটি স্বাগত অভিভাষণ জানানো হয়। এই সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতাদের উজ্জীবিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন "ওঠ! জাগো! লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত গতি রুদ্ধ ক'র না। কলকাতাবাসী

যুবাগণ, তোমরা ওঠ, জাগ্রত হও, সুযোগ্য প্রহর সমাগত, আমাদের সম্মুখে সব কিছু ইতিমধ্যেই উন্মুক্ত; ভয় পেলে চলবে না, সাহস অবলম্বন কর···ওঠ, জাগো! তোমার দেশের জন্যই এই দুর্জয় আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। যুবকদের দ্বারাই এ কাজ সম্ভব। যারা তরুণ, উদ্যমী, বলবান, সুদেহী এবং বুদ্ধিমান—এ কাজ কেবল তাদেরই জন্য এবং কলকাতায় এই রকম শত সহস্র তরুণ রয়েছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে ভারতবর্ষের বৃহত্তর অঞ্চলে গত বছর বহুল প্রচারিত বিপ্লবী প্রচার পুস্তিকা 'লিবার্টি' বিবেকানন্দের মন্ত্রবাণী দিয়েই শুরু হত: "উত্তিষ্ঠত, জাগত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

ঐ একই বক্তৃতায় স্বামীজী এও বলেন যে "ভারতবর্ষের পতন ও দারিদ্রের অন্যতম প্রধান কারণ হল এই যে সে নিজেকে সঙ্কুচিত করে খোলার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। "সুতরাং আমাদের বেরিয়ে পড়তেই হবে। দেওয়া আর নেওয়া হল জীবনের ধর্ম। কিন্তু আমরা কি সব সময় পশ্চিমীদের পায়ের তলায় বসে সব কিছু, মায় ধর্ম পর্যন্ত, খালি শিখতেই থাকব?"

মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেন সারস্বত সমাজে (Triplicane Literary Society) প্রদত্ত "আমাদের কর্তব্য" (The work before us) শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী আবারো বলেন যে, যে কারণগুলির জন্য ভারতবর্ষ অধঃপাতে যেতে বসেছে তাদের মধ্যে একটি হল এই যে "আমরা আমাদের দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছি, আমাদের কর্মের পরিধিকে সঙ্কুচিত করে চলেছি।" "যে জাতি এক গ্লাস জল ডান না বাঁ হাত দিয়ে পান করতে হবে, এমনি সব গূঢ় সমস্যা নিয়ে অগুন্তি বছর ধরে আলোচনায় নিবিষ্ট, তার কাছ থেকে আপনারা আর কিই বা আশা করতে পারেন? একটা জাতির সর্বোচ্চ মনীষা, কয়েক শ' বছর ধরে শুধু রান্না ঘরের প্রসঙ্গ কিংবা নিছক আমার তোমাকে ছোঁয়া উচিত, না তোমার আমাকে ছোঁয়া উচিত, আর সে ধরনের ছোঁয়া ছুঁয়ির প্রায়শ্চিত্তই বা কি, এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এসেছে—এর থেকে চরম অধঃপতনের আর কি থাকতে পারে? বেদান্তের মনীষা এবং ঈশ্বরের মহামহিময় ও ভূমা স্বরূপ প্রকৃতি সম্পর্কে, পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় বেদান্তের উপদেশগুলি অর্দ্ধলুপ্ত অবস্থায় মাত্র কতিপয় সন্ন্যাসী অরণ্য অঞ্চলেই টিকিয়ে রেখেছেন। আর জাতির বাকি অংশ পারস্পরিক ছুঁৎমার্গ, পোশাক এবং খাদ্যাদি বিষয়ক গভীর সমস্যা নিয়ে মগ্ন রইল। তার পর ভালই হোক আর মন্দই হোক, ভারতবর্ষে ইংরাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। আধিপত্য অবশ্য সব সময়েই খারাপ

কেননা আধিপত্য হল (এক ধরনের) পাপ। বিদেশী শাসন যে অমঙ্গলময় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অমঙ্গলের মধ্য দিয়েই যেমন কখনো কখনো মঙ্গল সূচিত হয় তেমনি ভারতবর্ষে ইংরাজ আধিপত্যেরও একটা মঙ্গলময় দিক রয়েছে। ইংল্যাণ্ড তথা গোটা ইউরোপ তার সভ্যতার জন্য গ্রীসকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। ইউরোপের সব কিছুতেই গ্রীসের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। সেখানকার প্রতিটি বাড়ি, এমনকি প্রতিটি আসবাবের উপরেও গ্রীসের প্রভাব প্রকটিত। ইউরোপের শিল্প ও বিজ্ঞান গ্রীসিয় রীতির। আর আজ ভারতবর্ষের মাটিতে (ইংরাজ আধিপত্যের সুবাদে) প্রাচীন গ্রীকেরা এসে প্রাচীন হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সংশ্লেষের প্রক্রিয়াটি ধীরে ও নীরবে ঘটেই চলেছে। আমাদের চার দিকে পুনরভ্যুত্থানের এই ব্যাপক এবং সঞ্জীবনী জোয়ার, এই সব নানা পরিস্থিতির একত্র সন্নিবেশের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আমাদেরও সেই এক আদর্শ, ভারতবর্ষ আজ সমগ্রকে জয় করার প্রত্যাশী এবং আমাদের তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের প্রতিটি স্নায়ুকে সক্রিয় রেখে তৈরী হতে হবে, যাতে পুরো মাত্রায় অভীষ্ট লাভ ঘটে। বিদেশীরা সৈন্য সমভিব্যাহারে এ দেশ ছেয়ে ফেলুক, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। হে ভারত, তুমি তোমার আধ্যাত্মিকতার শক্তি নিয়ে দুনিয়া জয় করার জন্য জাগ্রত হও। এই দেশের মাটিতেই একদিন ঘোষিত হয়েছিল, যে হিংসা কখনো আপনাকে জয় করতে পারে না, ভালবাসা দিয়েই হিংসাকে জয় করতে হয়। ঐহিকতার সাহায্যে ঐহিকের দুঃখভোগ জয় করা সম্ভব নয়। সৈন্য দিয়ে সৈন্যবিজয়ের প্রচেষ্টা শুধু সৈন্য সংখ্যাই বাড়িয়ে চলে আর তার ফলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। আধ্যাত্মিকতার সাহায্যে পশ্চিমকে জয় করতেই হবে। ক্রমে ক্রমে তারা নিজেরাও বুঝছে যে জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য তাদের দরকার অধ্যাত্ম চেতনা এবং তার জন্যেই তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।"

ঐ একই সিরিজে 'ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক স্বামীজী প্রদত্ত অপর একটি বক্তৃতাও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

এই অনুষ্ঠানে নানাবিধ মন্তব্য করার ফাঁকে বক্তা তাঁর শ্রোতৃ মণ্ডলীকে 'ভারত সন্তান' নামে সম্ভাষণ করেন। তিনি বলেন যে অতীতকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ এবং এই কারণেই তিনি তাঁদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান। "আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে মহান ছিলেন সে কথা আমাদের প্রথমেই স্মরণে আনা কর্তব্য। আমাদের অস্তিত্বের উপাদান

অর্থাৎ আমাদের ধমনীতে কোন ধরনের রক্ত বয়ে চলেছে তা জানা দরকার। সেই রক্তের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রাখতে হবে, তার অতীতকে জানতে হবে। সেই শ্রদ্ধা এবং অতীত গৌরব সম্পর্কে সেই সচেতনতার বোধকে ভিত্তি করেই আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকেও মহিমময় আর এক ভারতবর্ষ গড়ে তুলব। অবশ্য অতীতেও অধঃপতন ও অবক্ষয়ের যুগ ছিল। কিন্তু সে সব যুগের প্রয়োজনও ছিল—আমি তাই সেগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই না।” স্বামীজী বলেন, “সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আমরা সেই ঐতিহ্যের শিলাগাত্রে প্রথম সোপানটি রচনা করতে চাই এবং সেই বনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই আমাদের ভবিষ্যৎ ভারতকে গড়ে তুলতে হবে। আমরা সকল হিন্দু অর্থাৎ দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অথবা অদ্বৈতবাদী এবং শৈব, বৈষ্ণব ও পাশুপত প্রভৃতি যে সম্প্রদায়েরই লোক হই না কেন, আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই সব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটা সাধারণ ভাবগত ঐক্য রয়েছে এবং এখন আমাদের নিজেদের স্বার্থেই, আমাদের স্বজাতির মঙ্গলের জন্যই এই সব তুচ্ছ কলহ ও মতবিরোধের ঊর্ধ্বে ওঠার সময় এসেছে। জেনো, এই সব কলহ একেবারেই নিরর্থক। আমাদের শাস্ত্রে এ সবের নিন্দা করা হয়েছে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এ সব নিষেধ করে গিয়েছেন এবং যাঁদের রক্ত আমাদের শিরায় প্রবাহিত, এবং যে সব মহান পুরুষদের উত্তরাধিকার আমরা দাবী করে থাকি তাঁরাও তাঁদের সন্তানদের এই সব তুচ্ছ বিরোধ নিয়ে দ্বন্দ্বে নিমগ্ন হতে দেখে ঘৃণা বোধ করেন।”

বক্তা এরপর দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতি যে উত্তর ভারতের আর্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সেই আলোচনায় প্রবিষ্ট হয়ে উল্লিখিত প্রচলিত মতবাদটি খণ্ডন করতে অগ্রসর হন। “একটি মাত্র ব্যাখ্যা”, তিনি বলেন, “যা মহাভারতে পাওয়া যায়, তা হল এই যে সত্য যুগের প্রারম্ভে একটিই মাত্র জাতি ছিল এবং তারা হল ব্রাহ্মণ কিন্তু কালক্রমে বৃত্তির বিভিন্নতা অনুযায়ী তারা নিজেদের বিভক্ত রেখেছিল। প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে এটিই সব চেয়ে যথার্থ ও যুক্তি-সঙ্গত। আগামী সত্য যুগের মধ্যে অন্য সব জাতিগুলিকে পুনরায় সেই এক সাম্য দশায় ফিরে যেতে হবে। অতএব ভারতবর্ষের জাতিভেদ সমস্যাকে এমন ভাবে সমাধান করতে হবে যাতে উচ্চ জাতিকে নীচে না নামতে হয় বা ব্রাহ্মণদের অবলুপ্তি ঘটে। উঁচুকে টেনে নামানোটা কোন সমাধান নয়, বরং নীচুকে উপরে তোলার প্রয়োজন।”

অতঃপর স্বামীজী কি করে তুলনামূলক ভাবে স্বল্প সংখ্যক ইংরাজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল সেই প্রশ্ন আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর মতে এটি সম্ভব হয়েছিল কেননা ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর প্রত্যেকে একে অপরের চেয়ে ভিন্ন ইচ্ছার বশীভূত ছিল, আর ইংরাজরা সেই জায়গায় প্রতি জনের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সংহত করতে সক্ষম হয়েছিল। "এই সংহতির অর্থ অপরিসীম শক্তি। গোটা পৃথিবীতে এই ভাবেই সব কিছু হয়ে এসেছে। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ক্ষুদ্র অথচ সংহত জাতিগুলি এই ভাবেই সর্বত্র বেঢপ আকৃতির জাতিগুলির উপর তাদের শাসন এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এসেছে।······(সুতরাং) এই সব বিভেদকে আমাদের থামাতেই হবে।"

তিনি বলেন যে ঠিক যেভাবে এতদিন ধর্মপ্রচার করে আসা হয়েছে সেই ভাবেই এখন থেকে প্রতিটি গৃহে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রচার করা উচিত। "এই কাজটি সহজেই সিদ্ধ করা যেতে পারে। অতঃপর এই সব শিক্ষক এবং প্রচারকগণের সহায়তায় এই কর্মসূচীকে আরও ব্যাপক আকারে প্রসারিত করা যেতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে এই রকম নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো। এই কাজের জন্য আমার দরকার যুব শক্তি। বেদ বলেছেন, শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান এবং প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন যুবাদলই কেবল মাত্র ঈশ্বর লাভে সক্ষম। আপনাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করার উপযুক্ত সময় এখন সমাগত। আপনারা কি ক্লান্ত এবং অবসন্ন দেহে যৌবনের শক্তি শুধুই সঞ্চয় করে রাখবেন? সময় সংক্ষেপ, আপনারা জাগ্রত হোন। তুচ্ছ বিরোধে লিপ্ত থাকা বা আইনজীবি হওয়ার স্বপ্ন দেখার চেয়ে জীবনে আরও অনেক বড় কাজ করবার আছে। নিজ জাতির উন্নতি কল্পে আত্মোৎসর্গ করাটাই হল সব চাইতে বড় কাজ। জীবন বড় স্বল্পস্থায়ী এবং মৃত্যু সুনিশ্চিত হলেও আত্মা শাশ্বত এবং অবিনাশী। অতএব আসুন, আমরা একটা মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি এবং সেই আদর্শের জন্য আমরা জীবন সমর্পণে প্রস্তুত হই।"

মানিকতলা বোমা মামলার অনুসন্ধান চলা কালে জানা যায় যে গোটা ভারত জুড়ে প্রচারক প্রেরণ করার জন্য স্বামীজী এই সময় যে প্রস্তাব করেছিলেন তা পরবর্তী কালে বারীণ ঘোষ এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা (সম্পূর্ণ রূপে) পালিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রচার কেন্দ্র

স্থাপন করার জন্য স্বামীজীর এই সময়কার আদেশ পূর্ব বাংলার বিপ্লবীগণ কিভাবে পালন করেছিলেন সে কথাও এই রিপোর্টের পরবর্তী কোন অংশে উল্লেখ করা হবে।

উপরে বর্ণিত স্বামীজীর এই শিক্ষা ও মতাদর্শ তাঁর 'বর্তমান ভারত' নামক অপর এক কৌতূহলোদ্দীপক বক্তৃতাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। এই বক্তৃতায় স্বামীজী শুধু ধর্ম বিষয়েই নিজের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন নি, পক্ষান্তরে স্বদেশে ভারতবাসীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও তিনি নিতান্ত তীব্র ভাষায় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেছিলেন। তিনি প্রথমেই বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনে ভারতবর্ষের পুরোহিত সমাজের ক্ষমতা কি ভাবে ক্ষয় পেয়েছিল সেই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এ দেশের পুরোহিত সমাজ ও রাজন্যবর্গ আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় অবিরত বিরোধে লিপ্ত ছিল এবং যুগান্তরের মধ্য দিয়ে এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়ের পর চিরদিনের মত প্রশমিত হয়েছে। স্বামীজী বলেন, "কিন্তু এই যুগের শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি ভারত-সংসারে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।[৬]

"এই শক্তি এত নূতন, ইহার জন্ম-কর্ম ভারতবাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহার প্রভাব এমনই দুর্ধর্ষ যে, এখনও অপ্রতিহতদণ্ডধারী হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র ভারতবাসী বুঝিতেছে, এ শক্তিটি কি! আমরা ইংলণ্ডের ভারতাধিকারের কথা বলিতেছি।

"অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্যেপূর্ণ ভারতের বিশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকার স্পৃহা উদ্দীপিত করিয়াছে। বারংবার ভারতবাসী বিজাতির পদদলিত হইয়াছে। তবে ইংলণ্ডের ভারতাধিকার-রূপ-বিজয় ব্যাপারকে এত অভিনব বলি কেন?...কিন্তু যে বৈশ্যকুল—রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটুম্ব গণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত —মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার অনুরোধে[৭] নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মুসলমান রাজা-গণকে আপনাদের ক্রীড়া পুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাঁহাদের শৌর্যবীর্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে ও যে দেশের মহাকবির অলৌকিক তুলিকায় উন্মেষিত, গর্বিত লর্ড এক জন সাধারণ ব্যক্তিকে

বলিতেছেন, 'পামর, রাজ সামন্তের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিস'—অচিরকাল মধ্যে ঐ দেশের প্রবল সামন্তবর্গের উত্তরাধিকারীরা যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিক্ সম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়া মানব জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ সোপান ভাবিবে, (ইহা) ভারতবাসী কখনও দেখে নাই !!

"এ দেশের কথা কি বলিব ? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক ; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থি মজ্জায় ; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই ! আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশ সাধনে একান্ত ইচ্ছা আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে।...কিন্তু আশা আছে। কাল প্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্র জাতিও উচ্চ স্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইউরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খধূপতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চ বর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য।

"তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্র ধর্ম কর্ম—সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"[৮]

স্বদেশবাসীর বর্তমান অবস্থায় স্বামীজী যে কি তীব্র মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। তা তাঁর ঐ একই বক্তৃতা থেকে গৃহীত নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

"প্রজোৎপাদন ও 'যেন তেন প্রকারেণ' উদর-পূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধি ; আর উচ্চবর্ণের—ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়, এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই ; ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান। ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন-প্রণালীতে কতকগুলি দোষ

বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে।…এই সকল ভাবের মধ্যে (অর্থাৎ ইংরাজরা যেগুলি এদেশে প্রবর্তন করে) কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এ দেশের যথার্থ কল্যাণ নির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।…ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তাহার দীর্ঘ সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিতেছে।"[৯]

অতঃপর স্বামীজী আরও বলেন—

"সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহত শক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোন প্রজারই রাজ শক্তির নিয়ন্ত্রনে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যাভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজা নিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহু কল্যাণ সাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়।…ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই…কিন্তু ইংরেজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারত সাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজ জাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর পক্ষে ইংরেজ জাতির 'গৌরব' সদা জাগরূক রাখা। এই হাস্যকর এবং নিতান্ত করুণ মনোভাব কি ভাবে ইংরাজের চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং এই মানসিকতাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাহারা কিরূপ তৎপরতার সহিত ব্যাপক কর্মপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছে তাহা দেখিলে যুগপৎ হাস্য ও চক্ষুবারি উদয় হয়।…যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত !! চতুর্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দু রক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্য গৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণের বংশ মর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ জাতি, উহারা অনার্য জাতি !!

উহারা আর আমাদের নহে। হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাস সুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?"

বক্তা তারপর এই বলে শেষ করেন,"...হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

স্বামীজীর বক্তৃতা এবং রচনাবলী থেকে এই রকম একই সুরের বহু অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু স্বামীজীর শিক্ষার মূল নীতিগুলি বর্তমান কালের বিপ্লবী দলগুলিকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল এবং ভারতবর্ষের যুব মানসে বিপ্লব এবং নৈরাজ্যের বীজ বপন করার প্রয়াসে স্বামীজীর বাণী ও রচনা সমূহ কি ভাবে এই সব সমিতিগুলির দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বলা হয়ে গিয়েছে। এই প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে এ-ও দেখানো হবে যে মানিকতলা ষড়যন্ত্রের নেতা অরবিন্দ ঘোষের শিক্ষাদর্শও আসলে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অনুসরণেই রচিত হয়েছিল। বস্তুত তিনিও বাহুবল অথবা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আবেদন জানান এবং ভারতবর্ষের নব জাগরণের জন্য এর প্রয়োজনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

৪

ভগ্নী নিবেদিতা

কুমারী নোবল তথা ভগ্নী নিবেদিতা যাঁর সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দের সেই অন্যতম প্রধানা শিষ্যা সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে সুবিধা মত আলোচনা করা যেতে পারে।

ভগ্নী নিবেদিতা নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই স্বামীজীর কর্মকাণ্ডের রাজনৈতিক দিক গুলি, তাঁর প্রিয় পাত্র শিষ্যদের অন্যতমা এই মহিলার সংস্পর্শ হেতু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

এই মহিলা ১৮৬৭ সালের অক্টোবরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এঁর বাবা ও মা উভয়েই ছিলেন আইরিশ। এঁর বাবা রেভারেণ্ড এস. আর নোবল (Rev. S. R. Noble) ছিলেন ধর্মসভার পুরোহিত (Congregational minister)। সম্ভবত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী নোবল প্রথম স্বামীজীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন

এবং পরের বছর তিনি ইংল্যাণ্ডে এলে আবারও তাঁর দেখা পান। এই সময়েই তিনি স্বামীজীর কাজে সাহায্য করবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৯৮ এর গোড়ার দিকে স্বামীজীর সঙ্গেই তিনি ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করেন। এই বছরে স্বামীজীর সঙ্গে তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং এই ভাবে আলমোড়ায় এসে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার সত্য স্বরূপ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি রামকৃষ্ণ সমাজে আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষা লাভ করেন, তাঁর নাম হয় ভগ্নী নিবেদিতা। নিবেদিতা মানে 'সমর্পিতা', তাঁর একজন ভারতবাসী গুণগ্রাহী বলেন, ভারতের সেবায় তিনি যথার্থই নিবেদিত হয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে একাকী অবস্থান করতেন। এই খানেই তিনি কিণ্ডারগার্টেনের আদলে একটি মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতীয় রীতি অনুযায়ী সাজসজ্জা করতেন এবং খালি মাথায় ও পাদুকা ছাড়াই চলা ফেরা করতেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে যে তাঁর চরিত্র বড ভাল ছিলনা, এক দল বাঙালী যুবকের সঙ্গে তিনি এক বাড়ীতে থাকতেন এবং এই সব কারণে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ভারতীয় নাগরিকেরাও তাঁকে বিশেষ ভাল চোখে দেখতেন না। বাহ্যত তাঁর খরচ খরচা রামকৃষ্ণ মিশনই যোগাতেন।

তার প্রথম সাহিত্য কীর্তি *Kali the Mother* ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালেও তিনি *Web of Indian Life* নামক অপর এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। *Pioneer* পত্রিকার ১২ মে ১৯০৫ সংখ্যায় এই বইয়ের একটি পর্যালোচনায় মন্তব্য করা হয় যে, এই বইটি প্রচ্ছন্ন ভাবে অল্প-বিস্তর একটি রাজনৈতিক পুস্তিকা ধরনের এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এটাই প্রচার করা যে, ভারতবর্ষ কোন ক্রমেই একটি বহুধা বিভক্ত জাতি বা ধর্মের এলোমেলো সংগঠন নয়, ভারতবর্ষ মানে একটি জাতি এবং এই বইতে সেই জাতীয় সত্বার প্রতি আবেদন জানান হয়েছিল যাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে তার ভবিষ্যৎতে সার্থক করে তুলতে পারে। পুস্তক পর্যালোচক সব শেষে মন্তব্য করেন "ধূর্ততা, বইটির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এবং এর বিষয় বস্তুও আগাগোড়া দুরভিসন্ধিমূলক।" লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, এই বইটিতে যে সব আদর্শের কথা ভগ্নী নিবেদিতা প্রচার করেছিলেন, সেগুলি তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে উল্লিখিত শিক্ষাদর্শগুলিরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই তাঁদের মধ্যে বাহ্যত কিছু মতবিরোধ দেখা দেয়।

নিবেদিতা রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছেন বলে স্বামীজী কয়েকবার তাঁকে ভর্ৎসনাও করেন। নিবেদিতা ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের উগ্র সমর্থক এবং 'বন্দেমাতরম্'কে তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন।

'বন্দে মাতরম্' নামে যে রীতিমত রাজদ্রোহাত্মক পত্রিকাটি পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় সেখানে ১৯০৭ সালের একটি সংবাদে প্রকাশ পায় যে 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের জন্য যে কয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জামিন দাঁড়িয়েছিলেন, ভগ্নী নিবেদিতা ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ঐ একই বছরে তিনি স্বাস্থ্যের কারণে ইউরোপে যান এবং সংবাদে প্রকাশ যে পরের বছর গোড়ার দিকে তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী গিরীন্দ্র নাথ মুখার্জীর সঙ্গে লণ্ডনে একত্র বাস করেছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে বোস পাড়া লেনেই বসবাস করেন। এই সময়েই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তাঁরা বলেন যে. যেহেতু তাঁরা নিবেদিতার রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় আপত্তি করেছিলেন, সেই জন্য নিবেদিতাই কিছু দিন আগে তাঁদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা কর হবে।

১৯১১ সালে অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য আবার ভেঙে পড়ে এবং তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিং যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে তাঁর বিশেষ কিছু লাভ হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত ঐ বছরের অক্টোবর মাসে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পরের বছর গোড়ার দিকে কলকাতার টাউন হলে তাঁর উদ্দেশ্যে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বিপিন চন্দ্র পাল, প্রভাস চন্দ্র দে এবং বিপ্লবী দলের অন্যান্য সুপরিচিত সদস্যরাও যোগদান করেন।

জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার যোগাযোগ প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে এক জন গুণমুগ্ধ ভারতীয় এই রকম মন্তব্য করেন :

"ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশের জাতীয় আন্দোলনে তাঁর প্রভাব অস্বীকার করা অসম্ভব। সর্বশ্রী ব্লেয়ার (Blair) এবং র‍্যাটক্লিফ্ (S. K. Ratcliffe) এর মত দুজন অভিজ্ঞ বিচারক এই অভিমত পোষণ করেন যে, অন্য যে

কোন লোকের চেয়ে বাংলা দেশে তিনিই জাতীয়তাবাদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করতে সর্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম হয়েছিলেন। মিঃ ব্লেয়ারের মতে অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি সম্ভবত পৃথিবীর যাবতীয় সংবাদ পত্রগুলির চাইতেও বেশি পরিমাণে কাজ করিছিলেন।' শ্রীর‍্যাট ক্লিফ (নিবেদিতার সঙ্গে) তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের উল্লেখ করে পরবর্তী কালে *Daily News* পত্রিকায় লেখেন—'তাঁর উচ্চারিত ও লিখিত বাণীগুলির মাধ্যমেই জাতীয়তাবাদের ভাবধারা এত মনোগ্রাহী ও জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল।"

ভগ্নী নিবেদিতা এবং (রামকৃষ্ণ) মঠের সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে মঠের বর্তমান সেক্রেটারী সারদানন্দ সম্প্রতি মন্তব্য করেন—

"ভগ্নী নিবেদিতা মিশনকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই কারনেই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেন এবং কিছু দিন ধরে তাঁদের মধ্যে কথা বার্তাও বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর কিছু দিন আগে মিশন থেকে আলাদা হয়ে ভগ্নী নিবেদিতা স্বাধীন ভাবেই কাজ করেছিলেন।"

আগেই বলা হয়েছে যে ভগ্নী নিবেদিতা যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন সেই সময় রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যেই সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা যে সত্যিই সেই সময় মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে তখনও কিছু সন্দেহ ছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতা এবং ভগ্নী ক্রিশ্চিনা (Christina)-র বিভিন্ন কাজের উল্লেখ করে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সম্প্রতি 'মিশনে মহিলাদের কাজ' (*Women's Work in the Misson*) শীর্ষক প্রকাশনাটিতেও এই সন্দেহের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়, কেননা এই পুস্তিকাতে ভগ্নী নিবেদিতার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সকল কাজের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। তাছাড়া 'পরলোকগত ভগ্নী নিবেদিতার উজ্জ্বল স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য' রামকৃষ্ণ মিশনের তরফেই 'ভগ্নী নিবেদিতা স্মারক সমিতি' অর্থ সংগ্রহ করেছিল। উপরন্তু নিবেদিতার মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরে *Bengalee* পত্রিকায় যে শীর্ষস্থানীয় রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানেও লেখক এই মত মন্তব্য করেন—

"ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তিনি আগে থেকেই সহানুভূতি-

সম্পন্ন ছিলেন এবং তিনি অধিকাংশ জননেতাকেই চিনতেন এবং পরিচিত লোকেদের তিনি শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের তিনি সব চেয়ে কর্মঠ সদস্যা ছিলেন, সেটি স্পষ্টতই দুর্বল হয়ে পড়ল।"

কুমারী গ্রীনস্টাইডেল (টেগার্ট লিখেছেন Greenstile) তথা ভগ্নী ক্রিশ্চিনা নামক যে আমেরিকান মহিলার কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে তিনি আজও বোসপাড়া লেনের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের পর্দানশিন মহিলাদের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতার (আরব্ধ) কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

৫

রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকা সমূহ

জীবৎকালেই স্বামীজী হিন্দু ধর্মের শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী সমন্বিত 'উদ্বোধন' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। অদ্যাবধি চালু রামকৃষ্ণ মিশনের এই মুখপত্রটি প্রধানতঃ ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী এতে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় না। পত্রিকাটি রাজনীতি ব্যাপারে উদাসীন এবং এটি এই মত পোষণ করে যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে বরং জনসাধারণের মধ্যে বেদান্তের শিক্ষা প্রচার করেই ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণ সম্ভব করে তোলা যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যতিক্রম ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়। এগুলির অনুবাদ নিম্নরূপ—

"তোমরা সকলে মোহাবিষ্ট হয়ে আছ। তোমাদের শাসককুল তোমাদের বলে, তোমরা নীচ, পরাধীন, শক্তিহীন এবং হাজার বছর ধরে তোমরাও ভেবে এসেছ, তোমরা নীচ, অপদার্থ এবং পরাভূত মানুষের দল এবং এই সব নিয়ে নিরন্তর আত্মবিলাপের ফলেই তোমরা নিজেদের যা ভাব, তা-ই হয়ে পড়েছ। তোমাদেরই দেশের মাটিতে আমারও এই দেহ তৈরী হয়েছে, কিন্তু আমি ত তোমাদের মত নিজেকে ভাবতে শিখিনি। তাই সেই একই মানুষ যারা আমাদের সবাইকে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তারাই আজ আমাকে ভগবানের মত শ্রদ্ধা করছে। তোমরা যদি এমন চিন্তা করতে পার যে তোমাদের মধ্যে আছে অনন্ত শক্তি, জ্ঞান এবং

অমিত বীর্য এবং তোমরা যদি তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পার, তাহলে আমি যা হয়েছি তোমরাও তাই হতে পারবে।

কেবল উচ্চৈস্বর চিৎকার তুলে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে না। এখন প্রয়োজন শাণিত কৃপাণ আর মরণপণ সংগ্রামের। এখন মাতৃস্বরূপা কালী, মহাবীর (অর্থাৎ হনুমান বা হনু দেবতা) এবং ধনুর্দ্ধারী রামকে পূজা করার প্রয়োজন। মায়ের পূজার জন্য চাই রক্ত—নরবলি।"

মায়াবতী এবং মাদ্রাজ শাখা মিশন কর্তৃক যথাক্রমে 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং 'ব্রহ্মবাদিণ্' নামে দু খানি ইংরাজী মাসিক পত্রও প্রকাশ করা হয়। এগুলি ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস।

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর মিশনের পরিচালন ভার স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর অর্পিত হয়, তিনি এর প্রেসিডেণ্ট হন এবং এখনও সেই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। এঁর প্রকৃত নাম রাখাল দাস ঘোষ, নিবাস, ২৪-পরগণার বসিরহাট। ১৮৮০ সাল থেকেই তিনি মিশনের সভ্য আছেন।

পূর্বে উল্লিখিত স্বামী সারদানন্দ মিশনের সেক্রেটারী হয়েছিলেন এবং অদ্যাবধি সেই পদে বহালও আছেন।

কালক্রমে বেলুড়ের কেন্দ্রীয় মিশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও অনুমোদিত বিভিন্ন শাখা আশ্রমগুলি (নিম্নলিখিত) স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—

১। মাটিগঞ্জ, এলাহাবাদ। এই কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত 'শিব আশ্রম', দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করেছিল।

উপরোক্ত ধরনের অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও (নিম্নলিখিত) স্থানে খোলা হয়েছিল—

১। বেনারস সিটির অন্তর্গত লক্ষর

২। বংশীবট, বৃন্দাবন, মথুরা,

৩। শাহরাণপুরের অন্তর্গত কনখল

৪। বরিশাল (রামকৃষ্ণ মিশন) এবং

৫। মুর্শিদাবাদের সরগাছি (মিশন অনাথ আশ্রম)

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে আবার মঠ কর্তৃক স্বীকৃত শাখা কেন্দ্রও খোলা হয়েছি থ।

রামকৃ হোম, মাইলাপুর, মাদ্রাজ,

রামকৃষ্ণ াশ্রম, গোল টেম্পল রোড, বাঙ্গালোর সিটি।

৩। অদ্বৈত আশ্রম, বেনারস,

৪। আলমোড়ার অদ্বৈত আশ্রম এবং মায়াবতী এবং

৫। কলকাতার ১২ ও ১৩ নং গোপাল চন্দ্র নিয়োগী লেনে শ্রী (সারদা) মায়ের কলকাতাস্থ বাসভবন এবং 'উদ্বোধন'।

শ্রীশ্রীমা, অর্থাৎ সারদামণি দেবী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মপত্নী। এঁর জীবনবৃত্তান্ত ইতি পূর্বেই বলা হয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও রয়েছে এবং বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ এই গুলি সম্পর্কে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এগুলি ছাড়াও গোটা বাংলা দেশ জুড়ে অসংখ্য রামকৃষ্ণ আশ্রম রয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন লাভের জন্য আবেদনও করেছে, কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে এখনও (এদের মধ্যে কারওকেই) অনুমোদন দেওয়া হয়নি ব্যাপারটি নিয়ে পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে।

৭

বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিশনের যোগাযোগ

১৯০৬ সালে যখন পূর্বে উল্লিখিত অভেদানন্দ স্বামী আমেরিকা থেকে হাওড়ায় এসে উপস্থিত হন সেই সময়েই মিশন সম্পর্কে সর্বপ্রথম (সকলের) দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চরমপন্থী দলের অনেক সদস্য ঐ দিন হাওড়া রেল স্টেশনে এসে অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহযোগে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এই মানুষটি আমেরিকায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা সমূহ 'ভারত ও তার অধিবাসী' এই শিরোনামে ঐ একই বছর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বইটি বহুলাংশে আপত্তিজনক এবং কয়েক স্থানে স্পষ্টতঃ রাজদ্বেষে পূর্ণ। বোম্বাই সরকার প্রেস এ্যাক্টের বলে বইটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে স্বামী প্রেমানন্দকে তাঁরকাজে সহায়তা করার জন্য সঙ্গে নিয়ে স্বামী অভেদানন্দ ঐ বছরেই নিউ ইয়র্কে ফিরে আসেন। অভেদানন্দ এখনও আমেরিকাতেই রয়েছেন এবং জানা গিয়েছে যে নিউ ইয়র্কের নিকটবর্তী একটি কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন।

আমেরিকান মহিলাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় এমন অভিযোগও পাওয়া গিয়েছে এবং সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারও এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখছেন।

মানিকতলা বোমা মামলায় অনুসন্ধান কালে মিশন আবার পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষড়যন্ত্রকারীদের হোতা অরবিন্দ ঘোষ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন—

"এক সময় আমি বেদান্ত দর্শন ভিত্তিক এমন এক ধর্ম আন্দোলনের কথা ভেবেছিলাম যা ভারতবর্ষ, ইংল্যণ্ড এবং আমেরিকা অবধি ছড়িয়ে পড়বে। আমি সত্যই বিশ্বাস করতাম এবং এখনও করি যে, বৈদান্তিকতার মধ্যেই পৃথিবী তার ভবিষ্যৎ ধর্ম খুঁজে পাবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই আমি কয়েকটা মাস কঠোর পরিশ্রম করি এবং এই ব্যাপারে আমি আমার কয়েকজন বন্ধু ও পরিচিত মহলের দ্বারস্থ হয়েছিলাম।"

এই আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য অরবিন্দ, বরোদায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ভবানী মন্দির' নামে একটি প্রচার পুস্তক প্রকাশ করেন। মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সময় এই বইটি আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এই বইয়ে পাহাড়ের উপর মা ভবানীর নামে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। "এই পবিত্র কাজে সাহায্য করবার জন্য মায়ের সকল সন্তানের কাছে আবেদনও জানানো হয়েছিল।" পরবর্তী কালে অনুসন্ধানের ফলে আমাদের ধারণা হয়েছে যে রেওয়ার কাছে অমরকণ্টকেই অরবিন্দ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। লেখকের (অরবিন্দের) সংজ্ঞা অনুযায়ী ভবানী হলেন অনন্ত শক্তি স্বরূপা, তিনিই দুর্গা, তিনিই কালী, রাধা, দয়িতা, লক্ষ্মী, তিনি মা এবং নিখিল প্রাণী জগতের স্রষ্টা। ভবানীই শক্তি।

তিনি বলেন, শক্তির অভাবেই আমরা ভারতবর্ষে সব কিছুতেই হার স্বীকার করে চলেছি। শক্তির অভাবে আমাদের উদ্যমও আজ মৃতপ্রায়। শক্তি বিনা আমাদের ভক্তিও আর প্রাণে সাড়া জাগায় না।

এইভাবে তাঁর প্রতিটি বক্তব্য সবিস্তার আলোচনা করার পর লেখক (অরবিন্দ) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতবর্ষকে এখন কেবলই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে—

"আমরা যতই গভীরে দৃষ্টি প্রসারিত করি ততই আরও বেশী করে বুঝতে পারি যে, এখন শুধু একটি জিনিষেরই অভাব, এবং সেটি আমাদের সর্বাগ্রে অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে—শক্তি। দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি, নৈতিক শক্তি, কিন্তু সর্বোপরি চাই আত্মিক শক্তি যা অন্যান্য সকল শক্তির অনন্ত এবং অবিনাশী উৎস স্বরূপ। শক্তির অভাবে আমরা এমন এক

এক স্বপ্নাবিষ্ট মানুষে পরিণত হয়েছি যে হাত থাকা সত্ত্বেও সেই হাত দিয়ে আমরা আঘাত হানতে পারিনা কিংবা পা থাকা সত্ত্বেও আমরা পদ সঞ্চালনে অক্ষম। স্থবির ইচ্ছা শক্তি এবং বার্দ্ধক্যের ভারে আনত ভারতবর্ষকে আমাদের জাগিয়ে তুলতেই হবে।"

লেখক আরও দেখিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষকে যথার্থই জাগিয়ে তোলা সম্ভব। ভারতবর্ষ ক্ষয়িষ্ণু, রক্তশূন্য, নির্জীব এবং এতই দুর্বল যে ধ্বংসই তার অনিবার্য নিয়তি—এগুলি অলস এবং নির্বোধ ধারণা মাত্র। লেখক বলেন—

জাতি কি? জনগণের শক্তি।

জাতি কাকে বলে? আমাদের দেশ মাতৃকা বলতেই বা কি বোঝায়? দেশ মানে এক টুকরো মাটি বা নিছক কথার কথা অথবা স্রেফ মনের একটা কল্পনা মাত্র নয়। এ হল এক অপরিসীম শক্তি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে যে একটা জাতি গঠিত হয়, এ হল তাদেরই সম্মিলিত শক্তি, এ যেন সেই ভবানী মহিষ মর্দিনী যাঁর আধারে স্ফুরিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ দেবতার মিলিত তেজোপুঞ্জ। যে শক্তিকে আমরা ভারতবর্ষ বলি তিনি হলেন ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মূর্তিমান ঐক্যের শক্তি—ভবানী ভারতী। তিনি আজ স্থানুবৎ, তাঁর সন্তানগণের অজ্ঞতা এবং স্বেচ্ছারোপিত স্থবিরতা ও তমসার মায়াগণ্ডীর অভ্যন্তরে তিনি আজ বন্দী। এই তমসা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের অন্তস্থিত ব্রহ্মকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

"আমাদেয় নিজেদেরই ঠিক করতে হবে আমরা নিজেদের জাতি হিসেবে
গড়ে তুলব না নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।"

হাজার হাজার পবিত্র মানুষ, সাধু এবং সন্ন্যাসী, জীবন ভ'র একান্ত নীরবে আমাদের কি শিখিয়ে গেলেন? ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন সাধনা কোন্ মহান বাণী প্রচার করে গেল? সিংহ হৃদয় বিবেকানন্দের বাগ্মীতার মধ্যে কী এমন জিনিষ ছিল যা দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল? এ হল সেই জীবন্ত ঈশ্বর যিনি এই ত্রিশ কোটি মানুষের প্রতি জনের অন্তরে বিরাজমান, যিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সম্রাট থেকে আরম্ভ করে তাঁর আজ্ঞার দাস শ্রমিক, অথবা ত্রিসন্ধ্যাচারী ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে সকলের কাছে তাড়া খাওয়া পথের কুকুর পর্যন্ত সকল প্রাণীর অন্তরে অধিষ্ঠান করেন। আমরা সকলেই (একাধারে) ঈশ্বর এবং স্রষ্টা, কেননা আমাদের

মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের তেজ এবং আমাদের সমগ্র জীবন ব্যাপী সৃষ্টির প্রকাশ—সৃষ্টি মানে শুধু নতুন একটি আকৃতির জন্ম নয়, সৃষ্টি মানে স্থিতি, সংহারও বটে। আমরা কি সৃষ্টি করব, তা শুধু আমাদেরই উপর নির্ভর করছে, কেননা আমরা যদি নিজেরাই তাই চাই তো আলাদা কথা, তা নাহলে আমরা কেউ-ই নিয়তি বা মায়া নিয়ন্ত্রিত ক্রীড়নক নই, আমরা সেই অনন্তবীর্য শক্তিরই অংশ এবং বহিঃ প্রকাশ।

ভারতবর্ষকে নতুন করে জাগতেই হবে কেননা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বার্থেই তার নবজন্মের প্রয়োজন।

"ভারতবর্ষ মরতে পারে না, আমাদের জাতি কখনও ক্ষয় পেতে পারে না। কেননা সকল শ্রেণীর মনুষ্যকুলের মধ্যে এক মাত্র ভারতবর্ষেরই উপরে অর্পিত রয়েছে মানুষের ভবিষ্যৎকে সার্থক করে তুলবার বিধি-নির্দিষ্ট চমকপ্রদ এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার। ভারত আত্মার অন্তর থেকেই জন্ম নেবে গোটা পৃথিবীর আগামী দিনের ধর্ম—সেই প্রাচ্যের ধর্ম যা সমস্ত বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মমতের সমন্বয় ঘটিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করে রাখবে। নীতি জগতেও একই ভাবে ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বকে ম্লেচ্ছত্ব বা বর্বরতা থেকে মুক্ত করে সমগ্র পৃথিবীতে আর্য সভ্যতার উন্মেষ ঘটাবে। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য সর্বাগ্রে ভারতবর্ষেই পুনরায় আর্য সভ্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

মানব জাতির উপর অর্পিত সর্বকালের মহত্তম এবং আশ্চর্য জনক দায়িত্ব স্বরূপ এই মহান কাজটি আরম্ভ করে দেবার জন্যই ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল এবং বিবেকানন্দও সেই জন্যই ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এইভাবে যে সম্ভাবনা নিয়ে কাজটি শুরু হয়েছিল তা যদি আর না এগোয় তাহলে তোমরাই, তার জন্য দায়ী—তোমরা যারা ভীরুতা, সন্দেহ, সংশয় আর অলসতার তিমির তমসায় পুনরায় নিজেদের সমাছন্ন করে রেখেছ। আমরা (অর্থাৎ) আমাদের মধ্যে অনেকেই এই দুই জনের এক জনের কাছ থেকে লাভ করেছি ভক্তি, অপর জন যুগিয়েছেন জ্ঞান—কিন্তু শক্তির অভাবে, কর্মের অভাবে, আমরা আমাদের ভক্তিকে জীবন্ত করে তুলতে পারিনি। আমরা যেন এখনও স্মরণে রাখি যে, যিনি কালী, তিনিই ভবানী, শক্তি দায়িনী মা, যাঁকে রামকৃষ্ণ পূজা করতেন এবং যাঁর মধ্যে তিনি লীন হয়ে গিয়েছিলেন।

ভারতের ভাগ্য মাত্র কয়েকজন লোকের ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য থমকে রইবে না। মানুষ জেগে উঠে তাঁর পূজা শুরু করুক এবং দিগ্বিদিকে তা ছড়িয়ে দিক্—এটাই হল জগদম্বার ইচ্ছা। শক্তি লাভ করতে হলে শক্তিস্বরূপা জগদম্বাকে পূজা করার প্রয়োজন। শক্তি! আমাদের জাতির চাই শক্তি। শক্তি এবং অধিকতর শক্তি।"

অতঃপর বিবেকানন্দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অরবিন্দও জাপানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, আধুনিক কালে জাপানে যে রকম অভূতপূর্ব ভাবে শক্তির উন্মেষ ঘটেছে সে রকম চমকপ্রদ আর একটিও উদাহরণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

"অর্জুন যেমন অনায়াসে ও অপ্রতিহত ভাবে তাঁর গাণ্ডীব ধারণ করেছিলেন, সেই রকম ভাবে বর্তমানের দ্বীপময় সাম্রাজ্য জাপানও পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অমোঘ অস্ত্রগুলিকে কাজে লাগিয়ে চলেছে। এটা সম্ভব হয়েছে জাপানে ওয়েমাই-এর বেদান্তের শিক্ষা এবং শিণ্টো ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে। এ সবের জন্যেই মিকাডো-র পুনঃপ্রতিষ্ঠা তথা জাতীয় শক্তির আরাধনা পুনরায় প্রচলিত হয়েছে।"

"ভারতবর্ষের বৃহত্তর প্রয়োজন আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের

জাপানের চাইতে ভারতবর্ষকে অনেক বেশী পরিমাণে ধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করতে হবে। কারণ যে শক্তি তার ইতিপূর্বেই ছিল তাকেই সঞ্জীবিত এবং সম্পূর্ণ করা ছিল জাপানের (এক মাত্র) প্রয়োজন। সেই শক্তি আমাদের ইতিপূর্বে ছিল না, কিন্তু তাকেই আমাদের সৃষ্টি করতে হবে, আমাদের (সমগ্র) প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে, (যাতে) আমরা নতুন হৃদয়ের নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি, আমাদের পুনর্জন্ম ঘটে।"

লেখক মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষের প্রতিটি নবজাগরণ এবং তার ইতিহাসের প্রতিটি গৌরবময় এবং মহামহিমময় অধ্যায়ে সে কোন না কোন যুগান্তকারী ধর্ম আন্দোলনের শ্রোতোধারাতেই পুষ্টি সঞ্চয় করে এসেছে।

পরিশেষে তিনি বলেন ভারতবর্ষের এখন তিনটি জিনিষের প্রয়োজন এবং এগুলি তিনটি প্রধান অনুশাসনের পরিপূরক:

এক। ভক্তি তথা মাতৃ মন্দির

"শক্তি স্বরূপা মা'য়ের আরাধনা বিনা আমরা কিছুতেই শক্তি সঞ্চয় করতে পারব না। শ্বেত ভবানী তথা শক্তি স্বরূপিনী ভারত জননীর জন্য আমাদের তাই একটি মন্দির গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক শহরগুলির মলিন পরিবেশ থেকে বহু দূরে এমন একটি স্থানে আমরা এই মন্দির গড়ে তুলব যেখানে এখনও বহুল পরিমাণে মানুষের চলাচল শুরু হয়নি, যেখানে শুধুই খোলা বাতাস, প্রাণের উৎসাহ আর শান্তির একাধিপত্য। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই মায়ের পূজা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং চতুর্দিকের এই পাহাড়ের মাঝখানে পূজা লাভে তুষ্টা জননী অচিরাৎ তাঁর পূজারী গণের হৃদয় ও মস্তিষ্কের ভিতর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বেন। জগদম্বার নিজেরও সেই রকম ইচ্ছা।

দুই। কর্ম : একটি নতুন ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়

কিন্তু পূজার্চনাও নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে যদি না তাকে কর্মের মধ্যে রূপান্তরিত করা হয়।

মন্দিরের সংলগ্ন একটি মঠে আমাদের তাই নতুন একটি কর্মযোগী সম্প্রদায় গড়ে তুলতে হবে-সেখানকার প্রতিটি মানুষ মায়ের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে একত্রিত হবে। আশ্রমের কেউ কেউ ইচ্ছা করলে পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশই থাকবেন ব্রহ্মচারী হয়ে এবং আরব্ধ কাজ শেষ হওয়ার পর তাঁরা গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে আসতে পারবেন। তবে সকলকেই সংসার ত্যাগ করতে হবে। কেন ? প্রধানত দুটি কারণে—

(১) কেননা ঠিক যে পরিমাণে আমরা বস্তু জগতের আলস্য, আকাঙ্ক্ষা, লালসা এবং রতি সম্ভোগ অথবা দেহজ কামনা এবং সুখানুসন্ধান থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারব ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা আমাদের অন্তস্থিত অধ্যাত্মশক্তির মহাসমুদ্রে এসে মিলিত হতে পারব।

(২) কেননা, শক্তির উন্মেষের জন্য চাই পূর্ণ একাগ্রতা-বর্শাকে যেমন লক্ষ্য বস্তুর দিকে তাক করে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, মনকেও সেই রকম লক্ষ্যের প্রতি সম্পূর্ণ নিবিষ্ট রাখা দরকার। নানা রকম চিন্তা এবং বাসনা এসে যদি মনকে বিক্ষিপ্ত করে রাখে, তাহলে বল্লমটি তার সরল গতিপথ থেকে চ্যুত হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। আমরা চাই এমন মনুষ্য সত্তা যার মধ্যে

শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে, যে সত্তার প্রতিটি অণু, শক্তির প্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে পৃথিবীকে উর্বর করে তুলবে। হৃদয় এবং মস্তিষ্কে ভবানীর তেজোরাশি সংগ্রহ করে এই সব মানুষগুলি গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সেই তেজোপুঞ্জ ছড়িয়ে দেবে।

তিন। জ্ঞান, তথা পরম বাণী

জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে না উঠলে ভক্তি এবং কর্ম কখনই পূর্ণ হয় না, সার্থক হয়ে ওঠে না।

ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে তাই এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা জ্ঞান রূপ শিলাখণ্ডের উপর ভিত্তি করে তাদের সকল কর্ম সাধনাকে গড়ে তুলতে পারে, যাতে তাদের নিজেদের আত্মাও জ্ঞানার্জনের দ্বারা পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু কি হবে সেই জ্ঞানের ভিত্তি? কেন, সেই সোহহম মন্ত্র? বেদান্তের সেই শক্তি-মন্ত্র, সেই শাশ্বত উপদেশ যাকে জাতির হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি, সেই জ্ঞান যা কর্ম এবং ভক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত হলে তবেই মানুষ সর্বপ্রকার ভীরুতা এবং দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেতে পারে।"

'ভবানী মন্দির' নামক এই প্রচার পুস্তকটি থেকে কিছু সবিস্তার উল্লেখ করা হল, কেননা ভারতবর্ষের বর্তমান বিপ্লব আন্দোলনের যিনি হোতা এবং যাঁকে এ সবের প্রবক্তা বলা যেতে পারে সেই অরবিন্দ ঘোষ কিভাবে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শগুলি গ্রহণ করে যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্করণ সহ সেগুলিই আবার বিপ্লবের মন্ত্র হিসেবে তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন, তার নমুনা এই বইয়ের ভাষায় সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। অরবিন্দের মতে, শক্তি তথা বীর্য এবং কর্ম তথা সাধনার অভাবেই স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কাজগুলি ঠিক যে ভাবে শুরু হয়েছিল সেই মত আর এগোতে পারছে না। স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষের পুনর্জন্ম এবং জাগরণের পর তার ত্রিশ কোটি অধিবাসীর মিলিত উদ্যমকে কর্মে রূপান্তরিত করে তার মুক্তি সম্ভব করে তুলতে হবে। প্রসঙ্গত একটি সঠিক উদাহরণ দেওয়ার জন্য অরবিন্দ জাপানের বিস্ময়কর (অগ্রগতির) কাহিনী উল্লেখ করেছিলেন। স্বামীজী নিজেও ইতিপূর্বে তাঁর বক্তাদের কাছে জাপানের উদাহরণ উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু oyomei এর বেদান্তের শিক্ষা, শিণ্টো ধর্মের

পুনরভ্যুদয়, মিকাডোর বিগ্রহ ও ব্যক্তি সত্ত্বাকে অবলম্বন করে জাপানে জাতীয় শক্তি আরাধনার বিকাশ (ইত্যাদি) গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে কি রকম তুলনা রহিত ভাবে, জাপানে সহসা 'শক্তির পুনর্জাগরণ' ঘটিয়েছিল, সে দিকে অরবিন্দই প্রথম (সকলের) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মানিকতলা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল মাত্র অরবিন্দই যে বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন, এমন কথা বলা চলে না। আলমোড়ার মায়াবতী আশ্রমটির দ্বার সমুদয় সত্যসন্ধীদের জন্য পরলোকগত স্বামী স্বরূপানন্দ কর্তৃক পরম আতিথেয়তা সহকারে সর্বদাই উন্মুক্ত রাখা হত। যে সব শিষ্যেরা তাঁর আতিথেয়তার সুযোগ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মানিকতলা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী এবং হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, যাঁকে ঐ একই মামলায় দশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। এঁরা দুজনেই আলমোড়ার আশ্রমের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগের কথা স্বীকার করে জানান যে এখানে তাঁরা সন্ন্যাস জীবনে দীক্ষা লাভ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু শিক্ষানবিশী শেষ হওয়ার ঢের আগেই তাঁরা ঐ স্থান ত্যাগ করেন। বাংলা দেশের কয়েকজন বিপ্লবী বোম্বাইতে এসে উপস্থিত হলে সে'সময় তাঁদের যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন সেই বোম্বাই নিবাসী রামচন্দ্র প্রভুর সঙ্গে এই আশ্রমেই তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঐ একই মামলায় (মানিকতলা বোমা ষড়যন্ত্র) হাই কোর্টের কাছে আবেদনক্রমে যিনি শেষ পর্যন্ত নির্দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, বিপ্লবী দলের সেই অন্যতম সদস্য ইন্দ্রনাথ নন্দীও নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এই আশ্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

আশ্রমটি সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের দুই জন আমেরিকান শিষ্য ক্যাপ্টেন এবং শ্রীমতী সেভিয়ার (টেগার্ট লিখেছেন Siever) এর দ্বারা পরিচালিত হত। শ্রীসেভিয়ার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান, কিন্তু শ্রীমতী সেভিয়ার অদ্যাবধি সেই আশ্রমের অধ্যক্ষ হয়ে আছেন। ফৌজদারী গোয়েন্দা দপ্তরের অধিকর্তার (Director, Criminal Intelligence) মতে, শোনা যায় যে, মায়াবতী আশ্রমে শিক্ষালাভ করেও যারা নিজেদের সেই শিক্ষার অযোগ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করেছিল সেই রকম কিছু লোকের অস্তিত্ব টের পেয়ে এই মহিলা যার পর নাই বিরক্ত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিজেই উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বাহ্যত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, ১৯০৫ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করার

পূর্ব মুহূর্তে এই মহিলা পুণায় উপস্থিত হয়ে তিলকের স্ত্রী'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তবে তাঁর আমলে মায়াবতী আশ্রমে রাজদ্রোহ লক্ষিত হয়নি।

মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অপর যে তিন জন সম্পূর্ণরূপে ছাড়া পেয়েছিলেন, যথা কুঞ্জলাল সাহা, দেবব্রত বসু এবং শচীন্দ্র কুমার সেনও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শেষোক্ত দুইজন এখন পুরোপুরি ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। প্রথমজন প্রজ্ঞানন্দ এবং শেষোক্তজন শচীন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। শোনা যায় যে তাঁরা পুরনো মতাদর্শ এবং সহকর্মীদের সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে পুরোপুরি ভাবে ধর্মজীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাদ্রাজের মাইলাপুর শাখা আশ্রমটির সঙ্গে কুঞ্জলাল সাহা যুক্ত ছিলেন।

মানিকতলা মামলায় দণ্ড প্রাপ্ত ভবভূষণ মিত্র নামক অপর এক ব্যক্তি বেলুড় মঠে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এই মামলার বিচার চলা কালে অন্য আর একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশের কাছে একটি বিবৃতিতে ভবভূষণের সঙ্গে বেলুড় মঠের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন।

মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধান কাজে যে কয়টি খানাতল্লাসি চালানো হয়েছিল তার ফলে বেলুড় মঠের শিক্ষা তৎকালীন বিপ্লবী যুব সম্প্রদায়ের মনে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে কিছু নতুন আলোকপাত সম্ভব হয়েছে। এই তল্লাসির ফলে জানা গিয়েছে যে ১৯১০ সালে বাংলা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ কলকাতা অনুশীলন সমিতি নামক বিপ্লবী সংস্থাটির সঙ্গেও বেলুড় মঠের যোগাযোগ ছিল।

১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলার সুবাদে জাতীয় ছাত্রাবাস নামে পরিচিত ১১৭ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে তল্লাসী চালানো হয়েছিল। এই ছাত্রবাস থেকে যে সমস্ত সাক্ষ্য-বস্তুগুলি (exhibits) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা থেকে প্রমাণ হয় যে, ছাত্রাবাসের কয়েকজন আবাসিক অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং এটাও পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে যে ছাত্রাবাসটি বিপ্লবী এবং ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধান আস্তানা ছিল। (অনুসন্ধানে) প্রাপ্ত কুলচাঁদ সিংহ রায় নামক জনৈক ছাত্রের ১৯০৭ সালের এক দিনের তারিখ অঙ্কিত একটি এক্সারসাইজ খাতায় অনুশীলন সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এ-ও জানা যায় যে ন্যাশনাল কলেজের প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র অনুশীলন সমিতির সভ্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে (বেলুড়) মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উদ্‌যাপন

অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছিল। খাতার অন্য এক স্থানে পূর্বে কোন এক সময়কার মঠ পরিদর্শনের কথাও উল্লিখিত হয়েছিল এবং এটিকে বিপ্লবী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল এই রকম ইংগিতও দেওয়া হয়। বর্তমানে বাঙ্গালোরের রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত (একদা) বোসপাড়া লেন নিবাসী তুলসী চরণ দত্ত তথা স্বামী নির্মলানন্দের কয়েকটি মন্তব্য এই খাতায় টুকে রাখা হয়।

এই অনুষ্ঠানে (স্বামীজীর জন্ম জয়ন্তী) নির্মলানন্দ শারীরিক ব্যায়াম এবং উচ্চতর গণিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে শ্রোতাদের বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং (প্রয়োজন হলে) সেখানকার দুরূহ অংশগুলি ব্যাখ্যা করে দেওয়ার জন্য ছাত্রদের তাঁর কাছে আসতে বলেন। এর পর তিনি আরও বলেন, "আমরা চাই ছেলের দল। দুর্বল সাবালক বা বুড়িয়ে যাওয়া এবং ঝিমিয়ে পড়া বালক নয়, উদ্যমী ছেলের দল। কাজের প্রয়োজনে এই সব বালকদের সংগ্রহ কর। এই মঠ তো তোমরাই ব্যবহার করবে। ছার দেশের মুক্তি, তোমরা ইচ্ছে করলে গোটা দুনিয়াকেই মুক্ত করতে পার।"

এই সকল বক্তব্যগুলি থেকে অনুশীলন সমিতির কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে দুটি বিষয় অবগত হওয়া যায়—একটি হল, অনুশীলন (দলের) পাঠ্য পুস্তক—বিবেকানন্দের পাঠ এবং অপরটি হল বিশ্বাসী যুবক এবং তরুণদের দলভুক্ত করার প্রচেষ্টা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে, যে সূত্রে নির্মলানন্দের শিক্ষা চিন্তার উল্লেখ পাওয়া যায় সে সম্পর্কে মঠের বর্তমান সেক্রেটারী সারদানন্দ স্বামী এবং মঠের আরও একজন স্বামীজীর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ-ই একথা ব্যাখ্যা করতে পারেননি যে, কেমন করে স্বামীর (নির্মলানন্দের) শিক্ষা চিন্তা সম্পর্কে কুলচাঁদ ঐ রকম একটা ধারণা করে নিয়েছিল। তাঁদের দুজনরাই বিশ্বাস যে, উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁর (নির্মলানন্দের) আলোচনা সম্পর্কে ছাত্রদের ভুল ধারণা জন্মেছিল।

উপরোক্ত তল্লাসীর ফলে যে সব কাগজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯০৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন করার জন্য একদল ছাত্র নৌকা করে বেলুড়ে গিয়েছিলেন। খাতাটিতে লেখা আছে যে এই উপলক্ষে নদী বক্ষে যাওয়ার সময় হরেন্দ্র চন্দ্র পাল নামে একজন

সহযাত্রী এই রূপ মন্তব্য করেন—"আজ আমরা ছোট এই গঙ্গা নদী পার হয়ে অন্য তীরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। যখন এই দাস-জীবনের অপর পারে পৌঁছে আমরা বিজয় তূর্য এবং 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহযোগে চারি দিক উচ্চকিত করে স্বাধীনতার পতাকা ওড়াতে পারব, তখন না জানি আমরা আরও কত সুখী হবো। এমন চিন্তা কল্পনা করেও মন উৎসাহ আর আনন্দে ভরে ওঠে।"

কলকাতা অনুশীলন সমিতির আর এক জন বিশিষ্ট সভ্য, যোগেন্দ্র নাথ ঠাকুর তথা যোগেন ঠাকুরও এই সময় বেলুড় মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইনি 'যুগান্তর' এবং 'যুবক মণ্ডলী সারথি' প্রমুখ সংগঠনগুলিরও প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন।

সঠিক কোন্ পদ্ধতিতে বিপ্লবী দলগুলি বিবেকানন্দের শিক্ষানীতিগুলি গ্রহণ করে সেগুলি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাজে লাগিয়েছিলেন, তার একটি নিদর্শন সম্প্রতি চোখে পড়েছে। বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে এবং ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে বক্তৃতা দিয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্বে উল্লিখিত ইন্দ্রনাথ নন্দীও মানিকতলা দলের তরফে বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং সেই অবসরে তিনিও স্বামীজীর নির্দেশ মত তাঁর শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন ব্যবহার করেছিলেন। এই রকমের আরো কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।

৮

১৮৬০ সালের ২১ নং বিধি অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনের সমিতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ

১৮৬০ সালের ২১ নং বিধি অনুযায়ী ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামকৃষ্ণ মিশন যথাবিধি 'রামকৃষ্ণ মিশন' নাম নিয়ে সমিতিবদ্ধ হয়। সংগঠনের স্মারক পত্রে অপরাপর বিষয় ছাড়াও, সমিতির যে সব উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, সেগুলি হল—

১. বিভিন্ন শাখা ও বিভাগ সমেত তুলনামূলক ধর্ম এবং বেদান্তের শিক্ষার সম্যক প্রচার ও সম্প্রসারণ, ঠিক যেমন ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন দিয়েই বাস্তবানুগ ভাবে বেদান্তের অনুশাসনগুলি সম্পর্কে লোককে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

২. কলা বিজ্ঞান ও শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা প্রচার ও প্রসারণ।

৩. জ্ঞানের উপরোক্ত বিবিধ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান এবং সেই মত জনগণের দ্বারে তাঁরা যাতে উপস্থিত হতে পারেন তদনুরূপ চেষ্টা করা।

৪. জনগণের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম প্রচেষ্টা অক্ষুন্ন রাখা।

৫. স্কুল, কলেজ, অনাথ আশ্রম, কারখানা, গবেষণাগার, হাসপাতাল, দুর্ভিক্ষ ত্রাণ এবং অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন, পোষণ, পরিচালনা এবং সেগুলিতে সহায়তা দান।

৬. সমিতির উদ্দেশ্য সমূহ প্রচার করবার জন্য সমিতির ইচ্ছানুযায়ী সকল প্রকার পত্র, পত্রিকা, গ্রন্থ এবং প্রচার পুস্তিকা ছাপান এবং প্রকাশ করা ও সেগুলি বিনামূল্যে বিতরণ করা।

৯

গ্রাম আশ্রমগুলির বিকাশ

বাংলা দেশ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের যে সব স্থানে তাঁদের শিক্ষা উল্লেখ-যোগ্যভাবে (জনসাধারণের) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেই সব জায়গায় মিশনের স্বামীজীরা প্রায়শঃই ভ্রমণ করে আসতেন।

সত্য বটে যে পূর্বে উল্লিখিত কয়েকটি আশ্রম ভিন্ন, অন্য সকল শাখা আশ্রম-গুলির পরিচালনা ইত্যাদির দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশন কখনই স্বীকার করেনি। কিন্তু তথাপি স্বামীজীরা যখন সদর দপ্তর থেকে পরিদর্শন মূলক ভ্রমণে (tour) বে'র হতেন তখন বাংলা দেশ তথা পূর্ববঙ্গ এবং আসামে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের কয়েকটি আশ্রমও তাঁরা দেখে যেতেন।

বেলুড় মঠের স্বামী বিরজানন্দ যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন সেই সময় তিনি ও কলকাতার বউবাজারের ন্যাড়াগীর্জা অঞ্চলের অধিবাসী এবং বর্তমানে আমেরিকার স্যান ফ্রান্সিকো (San Francisco) কেন্দ্রে বসবাসকারী সুশীল-কুমার চক্রবর্তী তথা স্বামী প্রকাশানন্দ (যুগ্মভাবে) বিগত ১৮৯৮ সাল নাগাদ ঢাকায় একটি শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আগ্রহের অভাব হেতু ১৯০৫ সালে এই শাখা আশ্রমটি উঠে গেলেও পূর্ববঙ্গ এবং আসামের মহাকরণের কেরাণীকুলের প্রচেষ্টায় এটি ১৯০৭ সালে পুনর্গঠিত হয়। এই সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন জনৈক সুরেন্দ্র চন্দ্র বসু যাঁকে একদা

রাজনৈতিক কারণে নজরে রাখা হয়েছিল। ঢাকা অনুশীলন সমিতি কর্তৃক আয়োজিত জন্মাষ্টমী দিনের অনুষ্ঠানে যে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে, সেই ব্যাপারেও এঁকে সন্দেহ করা হয়েছিল।

ঢাকা জেলার সব্জি মহল, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং বজ্রযোগিনী অঞ্চলেও স্থানীয় লোকেরা রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা (কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মুর্শিদাবাদের যে অনাথ আশ্রমটির কথা ১২ পৃষ্ঠায় (বর্তমান অনুবাদের ৬৫ পৃষ্ঠা) সেটি ১৯০০ সাল নাগাদ সরগাছি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনিই এটি এখনও পরিচালনা করছেন। ব্যানার্জী তথা গাঙ্গুলি তথা অখণ্ডানন্দ নামক এই ব্যক্তিটি ১৮৬৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই এঁর ছোট ভাই কলকাতা পৌরসভার অফিসে ওভারসিয়ার হিসেবে চাকুরীরত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায়, অখণ্ডানন্দ ১৮৯৭ সাল থেকেই কাজ করে আসছিলেন এবং সেখানকার অর্ধ শিক্ষিত গ্রামবাসীগণ তাঁর ধর্মীয় বক্তৃতাগুলি শুনে প্রথম প্রথম রীতিমত মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। বস্তুত পক্ষে এমনও শোনা যায় যে গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই এক সময় তাঁকে স্বয়ং ভগবানের মত পূজাও করেছিল। তিনি মহুলা গ্রামেও কিছু দিন কাজ করেছিলেন। কিন্তু কয়েকজন শিষ্যাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং তাদের দ্বারা তিনি বিতাড়িত হন। এর পর তিনি পার্শ্ববর্তী সরগাছি গ্রামে আস্তানা করেন এবং এখানে তিনি বর্তমান অনাথ আশ্রমটি গ'ড়ে তোলেন। এইখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে ১২টি বালক বাস করছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ব্যভিচারী এবং এই কারণে আশ্রমের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক তাঁর আশ্রমে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

হুগলির কোন্নগর এবং গোবরহাটাতেও দুটি আশ্রম খোলা হয়েছে।

নদীয়ার জানিপুর গ্রামেও একটি শাখা খোলা হয়েছে।

১৯১১ সালে বাঁকুড়া সহরে শ্রী ডি. কে. সেন নামক জনৈক ব্যবহারজীবি কর্তৃক একটি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী এই ভদ্রলোক বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সভা সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে বয়কট এবং প্রতিরোধ আন্দোলন গ'ড়ে তুলে ১৯০৭-০৮ সালের মধ্যেই বিশেষ জন পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

১৯১২ সালে ফরিদপুরেও একটি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম খোলা হয়। এই

আশ্রমের দুজন বিশিষ্ট সদস্য রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন হয়েছিলেন। রাজনৈতিক কারণে বাংলা দেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুগণের সুপরিচিত আশ্রয় স্থান, পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী সেই আগরতলাতেও এই বছরে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। অনুমান করা যায় যে পার্বত্য ত্রিপুরায় বিপ্লবী দলের সদস্যগণের দ্বারাই এই শাখা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গত জানুয়ারীতে ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্র ঘোষের হত্যাকাণ্ডে জড়িত প্রিয় নাথ ব্যানার্জী এবং বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় চার বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত, পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলের সেই সক্রিয় সংগঠক নিশিকান্ত ঘোষ প্রমুখ বেশ কয়েকজন সুপরিচিত সন্দেহভাজন (রাজনৈতিক) ব্যক্তি এই কেন্দ্রে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

মিশনের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ইংগিত দেয় এমন কতকগুলি ঘটনা এই সময় কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয়েছিল। এগুলির সঙ্গে অবশ্য মিশনের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন যোগ ছিল না। কিন্তু তা হলেও এই ঘটনাগুলি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পূর্বে উল্লিখিত ভারত ভ্রমণরত আমেরিকা নিবাসী ব্যবহারজীবি মাইরণ ফেল্‌পস ১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজের মাইলাপুর রামকৃষ্ণ হলে শিক্ষার পুনর্বিকাশ এবং ভারতবর্ষের নব জাগরণ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বিপ্লবী দলের কলকাতা শাখার সঙ্গে জড়িত বলে যিনি নিজেই নিজেকে সনাক্ত করেন, রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন সেই নলিনী দে'কে এই বছরেই পুরীর মঠের সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে একত্র বাস করতে এবং তাঁর সঙ্গেই মিশনের সদর দপ্তর বেলুড়ে একত্র ফিরে আসতে দেখা গিয়েছে। নলিনী নামক এই ব্যক্তিটি এখন মিশনেই যোগ দিয়েছেন এবং ব্রহ্মচারী হিসেবে তিনি এখন মঠে শিক্ষানবীশ রয়েছেন।

১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রামকৃষ্ণের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বেলুড় মঠে আয়োজিত একটি বিশাল জনসভায় বিপ্লবী দলের পারিশ্রমিক গ্রহণকারী বক্তা (paid orator) লিয়াকৎ হুসেনকে আনা হয়েছিল। শোনা যায় যে তিনি (এই সভায়) চূড়ান্তভাবে রাজদ্বেষে পূর্ণ একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন এবং (সেই সঙ্গে) শ্রোতাদের, দেশ সেবা ও দেশের কারণে আত্ম বলিদান করার জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই রকম এবং এই ধরনের অন্য সকল সভাতেও বিপ্লবী দলের অনেকেই বেলুড়ে সমবেত হতেন বলে শোনা গিয়েছে। * মঠের কর্তৃপক্ষ অবশ্য সঙ্গত ভাবেই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, (মঠ সংলগ্ন) প্রাঙ্গণগুলি জনসাধারণের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে এবং এই সকল অনুষ্ঠানে হাজার হাজার লোক সমাবেশ হয়, (তাই এদের মধ্যে) কিছু সংখ্যক অবাঞ্ছনীয় লোকের উপস্থিতি কোন ক্রমেই এড়ানো যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, এই সকল ব্যক্তি এই সব জন সমাগমের সুযোগ নিয়ে সববেত জনতার মধ্যে যাতে রাজদ্বেষ ছড়াতে না পারে কিংবা এই সকল অনুষ্ঠানে মঠকর্মীদের কাজে সাহায্য করে তারা সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনে যাতে এই ধারণা সৃষ্টি না করতে পারে যে তারা মঠের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত কিংবা মঠ কর্মীদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে, সে ব্যাপারে মঠেরও যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে তা কর্তৃপক্ষ এত সহজেই অস্বীকার করতে পারেন না।

এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হবে।

১০

গ্রাম আশ্রম এবং বিপ্লবী আন্দোলন

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, রামকৃষ্ণ মিশন যেমন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছিল, তেমন রাজনীতি এবং অবাঞ্ছনীয় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গেও এটি যে সম্পূর্ণ ভাবে সংস্রব মুক্ত ছিল না, সে কথা (মোটামুটি) সকলেই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধান কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত এটা পরিষ্কার জানা যায়নি যে এই সব অননুমোদিত বা ভূয়া গ্রাম আশ্রমগুলি পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে কী পরিমাণে গজিয়ে উঠেছিল। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী দলের ৩৬ জন সদস্যকে শেষ পর্যন্ত এই মামলায় বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে যে ১২ জন অপরাধ স্বীকার করেছিলেন তাঁরা সকলেই দ্বীপান্তর ও বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাস দণ্ড লাভ করেন।

এই মানুষগুলির অধিকাংশেই ছিলেন ঢাকার নিষিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সদস্য। এঁরা পরস্পর একত্রিত হয়ে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দল ভারী করে চলেছিলেন এবং (সেই সঙ্গে) ঢাকা সমিতির ডাক সাইটে সর্বাধিনায়ক, পুলিন দাস নির্দেশিত পন্থায় ডাকাতি এবং নরহত্যা সমেত সুপরিকল্পিত অপরাধ অনুষ্ঠানের জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন।

এই মামলার অনুসন্ধানের প্রাথমিক স্তরে দলের নেতারা কি পদ্ধতিতে (দলে) নবীনদের আকর্ষণ করতেন সে ব্যাপারে (সকলের) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। শিকার হিসাবে যাদের বাছা হত বিপ্লবের শিক্ষাগুলি গ্রহণ করার মত (মানসিক ভাবে) উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে সমিতির বিপ্লবী কর্মসূচীর কথা স্রেফ চেপে গিয়ে বলা হত যে তাদের বর্তমান সংগঠনটি রামকৃষ্ণ মিশন, এবং এটি একটি (পুরোপুরি) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া পুলিশ এবং গ্রামবাসীদের অবাঞ্ছিত নজর এড়িয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা যাতে বিভিন্ন স্থানে মিলিত হতে পারে সেই জন্য তারা অনেক গ্রামে ভুয়া রামকৃষ্ণ আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেছিল।

বিপ্লবী দলের সদস্যগণকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে 'জেলা সংগঠন পরিকল্পনা' রচনা করা হয়েছিল সেখানেও উপরোক্ত পদ্ধতির কথা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত এই দলের জনৈক নেতা, রমেশ চন্দ্র আচার্যের নিকট থেকে এই পরিকল্পনা পত্রটি পাওয়া গিয়েছিল। এই (নির্দেশ নামার) একটি নিয়ম ছিল নিম্নরূপ—

"কাজের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য যদি কোন সাধারণ জায়গায় সদস্যগণ সচরাচর মিলিত হতে না পারেন তাহলে তাঁরা হরির লুঠ বা ঐ রকমের কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করে সেই অবকাশে পরস্পর জড়ো হতে পারেন।"

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে এই উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার সর্বত্র বিভিন্ন গ্রামে এই ধরনের রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার সময় রাজসাক্ষী রজনী দাস কবুল করেন যে (দলের) সদস্যগণের মধ্যে চিঠি চালাচালির সময় সেগুলি যাতে ভুল জায়গায় গিয়ে সব কিছু ফাঁস না হয়ে যায় সেই ভয়ে বিপ্লবী সমিতিগুলিকে রামকৃষ্ণ মিশন বলে উল্লেখ করা হত। কোর্টে জেরার সময় রজনী বলেছিলেন "সমিতিতে আমাকে যোগ দান করার জন্য যখন আহ্বান করা হয়, সেই সময়েই প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ব্যবহৃত হতে শুনি।" তিনি আরও বলেন "এই ভাবেই লোকদের প্রতারিত করা হত।" তিনি একথাও বলেন "যদি এমন আশংকা দেখা দিত যে যাকে দলে ভর্তি করতে যাচ্ছি তাকে স্বদেশী সমিতির কথা বললে সে আমার কোন কথাই শুনবে না তখন তার কাছে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কথাই বলতাম।···সমিতি প্রসঙ্গে

আমার সঙ্গে যখন প্রথম কথা বলা হয় তখন আমিও ভেবেছিলাম যে এঁরা যেন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার জন্যই আমাকে অনুরোধ করছেন।" বরিশাল মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ঐ দলের যতীন্দ্রনাথ রায় ওরফে ফেগুর কাছে লেখা রজনীর একটি চিঠি থেকে নেওয়া নিম্নোক্ত অংশটুকুর মধ্যেও উপরোক্ত রাজসাক্ষীর জবানবন্দীর আশ্চর্যজনক সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। "এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি পটুয়াখালি চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে যে করেই হোক যে কোন এক জনকে রামকৃষ্ণ মিশনে নিয়ে আসা যায় কিনা সেদিকে খেয়াল রাখবে। তুমি বিশেষভাবে চেষ্টা কোর।"

ঢাকা থেকে সমিতির সদস্যগণের কাছে লেখা আর একটি চিঠিতে ফেগু রায় বলেছিলেন যে ঢাকা থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠানো হচ্ছে এবং তাঁরা অর্থাৎ (বিপ্লবী দলের) সদস্যগণ তাঁর হাতে বিবেকানন্দের লেখা এক গাদা বই দেখেই তাঁকে চিনে নিতে পারবেন। এই ব্যক্তিটি সংকেত স্বরূপ ওঁ নমঃ ভগবতে 'রামকৃষ্ণ মিশন' লেখা এক টুকরো কাগজও দেখাবেন। এই চিঠির বিষয়বস্তু থেকে জানা গিয়েছে যে উক্ত দূতকে ষড়যন্ত্র (পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত) বরিশাল শাখাটির দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

রজনীকে সমিতিতে ভিড়ানোর জন্য যিনি দায়ী ছিলেন ষড়যন্ত্র (পরিকল্পনার) এই রকম একজন সদস্য জানিয়েছিলেন যে বাখরগঞ্জ জেলার অভয়নীল গ্রামেও একটি সন্দেহজনক রামকৃষ্ণ মিশন খোলা হয়েছে। একদা এই সংবাদদাতাকে ফেগু রায়-ই বলেছিলেন যে এই সব মিশনের আড়ালে বিপ্লবী দলের সদস্যগণ নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে পরস্পর মিলিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ খুঁজে পাবেন।

ঢাকায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সূত্র থেকে এই ব্যাপারে আরও সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। বসন্ত ভট্টাচার্য নামে ষড়যন্ত্র দলের একজন পুরনো সদস্য, দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে এই সময় পুলিশকে কিছু সংবাদ জানিয়েছিলেন। গত বছর ঢাকায় বিপ্লবী দলের হাতে এই ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর এঁর দেওয়া সংবাদ-গুলি যে কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বোঝা গিয়েছিল। এই ব্যক্তিটি বলেছিলেন যে, তিনি যতদূর জানেন তদনুযায়ী সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়ন এবং সেই জায়গায় হিন্দু শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইনি আরও বলেন "প্রতিটি সদস্যের এটা দেখা কর্তব্য যে অন্য আরও অনেকে যেন বিবেকানন্দের রচনাবলী

পাঠ করে এই সমিতির দলভুক্ত হন।" বাংলা দেশের বাইরে যে সব জায়গায় সদস্য পাঠানো হয়েছিল তাদের কথা উল্লেখ করে বসন্ত আরও জানান "মাদ্রাজের সদর কার্যালয়ে বিবেকানন্দের অনুগামী এই ছদ্ম পরিচয়ে এমন অনেকেই বাস করতেন যাঁরা সকলেই এই গুপ্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।"...

"ফরাসগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন নামে ঢাকার ফরাসগঞ্জেও একটি রামকৃষ্ণ মিশন রয়েছে। জ্ঞানরঞ্জন (জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটার্জী) নামে সমিতির একজন সদস্য প্রায় তিন মাস আগে আমাকে সেখানে যেতে বলেছিলেন। আমি সেখানে এক সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়ে দেখি যে সেখানে তখন একটি উৎসব চলছিল।

"নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রতুল গাঙ্গুলি, মদন ভৌমিক প্রমুখ আরও অনেকেই সেই স্থানে ছিলেন। জ্ঞানও সেখানে ছিলেন। আমরা কিছু জলযোগ করার পর সকলেই (স্থান ত্যাগ করে) চলে গিয়েছিল। জ্ঞান প্রায় প্রতি শনিবারেই এই মিশনে আসতেন।"

রিপোর্টে উল্লিখিত নরেন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁর এই দুই জন অনুগামীই হলেন বাংলা দেশের বর্তমান সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সব চাইতে বিপজ্জনক এবং বেপরোয়া তিনকর্মী।

নিহত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে ১৯১৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের একটি রিপোর্টে বসন্ত জানিয়েছিলেন যে ঢাকার ফরাসগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনটিতে জ্ঞানরঞ্জন নিয়মিত ভাবে হাজিরা দিতেন। রামকৃষ্ণ কথামৃত এবং বিবেকানন্দের কর্মযোগ থেকে পাঠ করে শুনিয়ে কি ভাবে কর্মী সংগ্রহ করা হত সে সব ব্যাপারেও তিনি আলোচনা করেন।

ষড়যন্ত্র (পরিকল্পনার) অন্যতম নেতা দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ-এর বরিশালের বাড়ীতে একটি বিবেকানন্দ পাঠাগার ছিল। এখানে ছিল এক সেট বিবেকানন্দের রচনাবলী, পাঠাগারের নিয়মাবলীর একটি অনুলিপি এবং ঐ সব বইয়ের একটি তালিকা। এই সব বইয়ের মধ্যে ছিল পূর্বে উল্লিখিত 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' এবং এটি স্পষ্টতই বরিশাল দলের সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করা হত।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত জানকী নাথ ঘোষ অতি সম্প্রতি যে জেলে তিনি বর্তমানে মেয়াদ ভোগ করছেন সেখানে বসেই একটি বিবৃতিতে কেমন করে তিনি এই গুপ্ত সমিতিতে এসে ভিড়লেন সেই প্রশ্নটির জবাব দেন। তিনি বলেন যতীন রায় ও রমেশ আচার্য নামে এই সমিতির দু-জন নেতা তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দূষিত পূর্ব বাংলার জেলা গুলির সর্বত্র কিভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের এই গ্রাম আশ্রমগুলি বিস্তার লাভ করেছিল, সে ব্যাপারে আরও অনুসন্ধানের ফলে সব কথা পরিষ্কার ভাবে জানা গিয়েছে।

দলের এক সময়কার সক্রিয় সংগঠক, পূর্ব বাংলার বিপ্লবী দলের জনৈক বিশিষ্ট সদস্য বর্তমানে কর্তৃপক্ষকে কিছু সংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন। এগুলি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন এবং পূর্ব বঙ্গস্থিত তার বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে ইনি বলেন—"আমি যত দূর জানি বেলুড়ের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে এই বিপ্লব আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু পূর্ব বাংলার সর্বত্র অসংখ্য ছোট ছোট রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলি ভাল মনেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কিন্তু অচিরেই বিপ্লবী দলের সদস্যগণ এগুলিতে এসে যোগ দেন এবং এই আশ্রমগুলি এখন সেই 'ভাবাদর্শ' ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি যতদূর জানি পূর্ব বাংলার প্রায় সব বিপ্লবীরাই নিজেদের রামকৃষ্ণের অনুগামী বলে অভিহিত করেন এবং সুযোগ পেলে তাঁরা বেলুড় মঠও দর্শন করে আসেন। পূর্ব বাংলার গ্রাম আশ্রমগুলি সব সমান রকমের খারাপ। এই সব আশ্রমগুলির মোট সংখ্যা আমি (সঠিক) বলতে পারব না। বিক্রমপুরে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একটি করে আশ্রম আছে। এগুলি হালে অর্থাৎ ১৯১০ সাল থেকে গজাতে আরম্ভ করেছে। গ্রামগুলিতে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা মাখন সেনই করেছিলেন।" এই সংবাদ সূত্রে উল্লিখিত মাখন সেন পূর্বে কথিত পুলিন দাসের বহিষ্কারের পর পূর্ব বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

প্রবল বারিপাত জনিত বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বর্দ্ধমান, হুগলি এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে কাজ করার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যে সব ত্রাণ সংগঠন তৈরী করেছিলেন তাদের সুবাদে ১৯১৩ সালের শেষাশেষি মিশনের প্রতি আবারও পুলিশের নজর যায়। সে সময়কার অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে ত্রাণ কাজের অছিলায় পুলিশের সন্দেহ উদ্রেক না করে পরস্পর মিলিত হওয়ার যে সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার বিপ্লবী দলগুলি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তারা দলে দলে বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয় এবং এই সুযোগে নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সমূহ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঠিক করে নিত। একটি রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল যে এই রকম ত্রাণ দলের

জনৈক নেতা অমরেন্দ্র নাথ চাটার্জী, এবং তাঁর দলের লোকেরা যে সব এলাকায় কাজ করছেন সেই সব জায়গায় রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আশ্রম স্থাপন করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী নামক এই ব্যক্তিটি পুলিশের কাছে খুবই পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে সম্প্রতি যে সব খবর পাওয়া গিয়েছে তার থেকে জানা যায় যে তিনি বর্তমানের একজন অত্যন্ত সক্রিয় এবং বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রকারী কর্মী।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে এই ব্যক্তিটির যোগাযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ স্বামী বন্যা ত্রাণের কাজে অমরেন্দ্রনাথের কাজের ব্যাপারে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু বন্যা ত্রাণের কাজে অমরেন্দ্রনাথ যে মিশনের কাছ থেকে ২০০ টাকা মত অর্থ সাহায্য লাভ করেছিলেন সে কথা তিনি স্বীকার করেন। অমরেন্দ্রনাথ যে বেলুড় কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুটা পরিচিত ছিলেন সেটা আরও প্রত্যক্ষভাবে জানা গেল যখন তাঁকে বেলুড়ের উৎসবগুলিতে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে দেখা গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গ পরে উল্লেখ করা হবে। ব্রহ্মচারী জ্ঞানানন্দ তথা বরিশালের জ্ঞানানন্দ দাশগুপ্তের পরিচালনায় বন্যার্ত এলাকায় রামকৃষ্ণ মিশন নিজেই একটি দল গড়েছিল। এই দলের সভ্যগণের নামগুলি সারদানন্দ জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এদের মধ্যে মাত্র চার জনের নাম করতে সক্ষম হন। এদের মধ্যে জনৈক প্রিয়নাথের নাম ছিল, কিন্তু সারদানন্দ এর সম্পর্কে পূর্ণ বৃত্তান্ত দিতে সক্ষম হননি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে গত নভেম্বর মাসে ২৯৬/১ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীটি তল্লাসী করার সময় অমৃত হাজরার যে গোপন নোট বইটি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেখানে এক টুকরো কাগজে "প্রিয়নাথ দাস, রামকৃষ্ণ মিশন মূল ত্রাণ কেন্দ্র, চাঁদপুর, ইছাপুর পুলিশ থানা, মেদিনীপুর" কথা কয়টি লিপিবদ্ধ ছিল দেখা যায়। এই অমৃত হাজরাকে আবার রাজাবাজার বোমা মামলার অপর তিন জন বিচারাধীন ব্যক্তি সহ বোমা সমেত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মনে হয় এই প্রিয়নাথ সেই একই ব্যক্তি, দলের সদস্য হিসেবে যার কথা সারদানন্দ উল্লেখ করেছিলেন। সারদানন্দ জানিয়েছেন যে এই প্রিয়নাথ এখন উদ্বোধন অফিসে শিক্ষানবিশী রয়েছেন এবং সেই হিসেবে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। (এই প্রতিবেদনের 'সংযোজনী' দ্রষ্টব্য)।

রাজাবাজার মামলার অনুসন্ধান চলা কালে যে কয়টি চিঠি বাজেয়াপ্ত করা

হয়েছিল তাদের মধ্যে মায়াবতী থেকে প্রেরিত 'অতুল' এই স্বাক্ষর যুক্ত একটি সন্দেহজনক পোস্ট কার্ড পুনরায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। চিঠিখানিতে যা লেখা ছিল তা এইরকম ঃ

প্রবুদ্ধ ভারত কার্যালয়
মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ অঃ
জিলা আলমোড়া, যুঃ প্রঃ
তাং ৩রা মার্চ ১৯১৪

ভাই বিনোদ,

অনেক দিন যাবৎ তোমার কোন খবর পাইনি। আশা করি এই চিঠির উত্তরে সকল সংবাদ জানিয়ে আমাকে সুখী করতে ভুল হবে না।

মেদিনীপুরের বন্যাত্রাণ কাজ ফেলে আমি হঠাৎ হিমালয়ে এসে পৌঁছেছি। মেদিনীপুরে বন্যাত্রাণের কাজ ভালই চলছে। তোমার পড়াশুনো কেমন হচ্ছে? শরীরের দিকে নজর রাখবে। দৈনিক কিছুটা ব্যায়াম করলে ভাল হয়। এ জায়গার বর্ণনা কি দেব? জায়গাটি ভারি মনোরম এবং সাধুদের পক্ষে উপযুক্ত। জায়াগাটি বাস্তবিক পূজার্চনার পক্ষেই উপযুক্ত, যেন সমস্ত মন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতে চায়। এখান থেকে বরাকরের সারি সারি পাহাড় দেখতে কী ভাল লাগে। জায়গাটার দূরত্ব এখান থেকে হাঁটা পথে প্রায় ১৫/২০ দিনের মত।

আমি ভালই আছি। তোমার কুশল সংবাদ জানিয়ে সুখী কোর। এই চিঠির বিষয়ে আমার গ্রামের কাউকে কিছু জানিও না। ইতি—

তোমার
অতুল (ব্রহ্মচারী ভরত)

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী
আশাকুটির, রাজশাহী/সমীপেষু

উপরোক্ত চিঠির লেখক 'অতুল' হলেন ঢাকা নিবাসী অতুল চন্দ্র গুহ যিনি ১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে বর্তমানে মায়াবতী আশ্রমে রয়েছেন এবং এখানে ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষানবিশী গ্রহণ করছেন।

ইতিপূর্বে রাজাবাজার মামলা প্রসঙ্গে যে অমৃত হাজরার কথা বলা হয়েছে তার বাড়ীতে সংকেত লিপিতে রচিত যে সব তালিকা পাওয়া গিয়েছে তার

মধ্যে উপরোক্ত চিঠির প্রাপক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর নামও খুঁজে পাওয়া যায়। (প্রফুল্ল নামক) ঢাকার এই বালকটি সম্ভবত উত্তর বাংলায় বিপ্লবের প্রচার কাজ চালানোর জন্যই রাজশাহীতে গিয়েছিল এবং অমৃতের অনুগামীরা এই পরিকল্পনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারও করেছিল।

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধান কালে রামকৃষ্ণ মিশন এবং তার উত্তর ভারতীয় শাখাকেন্দ্রগুলি পুনরায় পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মনে হয় বিশেষত কনখল শাখাটিই ষড়যন্ত্রকারীদের যোগাযোগের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার সুবাদে (পুলিশ) যাঁকে খুব খোঁজাখুঁজি করছিল সেই ফেরার রাসবিহারী বসুও কনখল হরিদ্বার শাখার সদস্য ছিলেন। বিপ্লব আন্দোলনের কাজে ইনি পাঞ্জাব এবং বাংলার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছিলেন। গত মার্চ মাসে পুলিশ এঁর চন্দননগরের বাড়ীতে তল্লাসী চালানোর সময় মিশনের বহু সদস্যের আলোকচিত্র এবং মিশন সংক্রান্ত (বিভিন্ন) পুস্তিকাদিও খুঁজে পায়।

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সম্প্রতি বিচারাধীন (আসামী) রঘুবীর শর্মার বাড়ীতেও কয়েকজনের নাম সম্বলিত একটি তালিকা পাওয়া যায়। এঁদের কাছে বিতরণের জন্য, কিছু রাজদ্রোহমূলক প্রচার পত্র পাঠানোর কথা ছিল। এই তালিকায় যাঁদের নাম ছিল তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী। এঁদের মধ্যে জনা পাঁচেক ছিলেন কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বাঙালী বাসিন্দা এবং এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে এঁদের মধ্যে চার জন, সম্ভবত মোট পাঁচ জনই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে এক জন, কলকাতার সিটি কলেজের ছাত্র, অবনীন্দ্র ঘোষ রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য ছিলেন। গত দুর্গা পূজার সময় ইনি বেনারসের রামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলেন এবং সেখান থেকে কনখল আশ্রমে যান এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে সেখানে এখনও বাস করছেন।

হাওড়ার নীতি চন্দ্র রায় নামে আরও এক ব্যক্তি বেলুড় মঠে নিত্যই যাতায়াত করতেন এবং বেলুড় ও কনখলের রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থানও করেছিলেন।

(উপরোক্ত) তালিকার তৃতীয় ব্যক্তি, কলকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং প্রাক্তন বিচারপতি সারদা মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, সুশীল কুমার মিত্রও প্রায়শঃ বেলুড় মঠ পরিদর্শনে যেতেন।

অপর যে ব্যক্তির ঠিকানায় যোগাযোগ করা হয়েছিল সেই অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জীও পূর্বোক্ত বর্ণনা মত রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পঞ্চম ব্যক্তি হরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সুস্পষ্ট যোগাযোগের কথা জানা না গেলেও, এই মত সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে এঁর মধ্যে ধার্মিক ভাব রয়েছে, এবং ইনি উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন ও দেরাদুনেও গিয়েছিলেন। অতএব এটা খুবই সম্ভব যে ইনিও রামকৃষ্ণ মিশনের উত্তর ভারতীয় শাখাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেছিলেন।

পুলিস বেশ কিছু দিন যাবৎ যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন এমন দু জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত ১৯১৩-১৪ সালের মধ্যে রামকৃষ্ণ আশ্রমেই খুঁজে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে এক জন, বলদেও রায়কে পাওয়া গিয়েছিল বেনারস আশ্রমে। ইনি সেখান থেকে কনখলে গিয়েছিলেন এবং সংবাদে প্রকাশ যে সেখানকার স্থানীয় আশ্রমেই তিনি বাস করছেন। সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত নামক অপর একজন পরিব্রাজক যিনি পূর্ব বঙ্গ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকেও বেনারসের সেবাশ্রমে খুঁজে পাওয়া যায়। এখানকার মিশন চিকিৎসালয়ে ইনি বর্তমানে কম্পাউণ্ডারের কাজ করছেন।

যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে বেলুড় এবং তার অনুমোদিত শাখা কেন্দ্রগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ উৎসবাদির সময় বহু রকমের আপত্তিকর অনুষ্ঠান পালন করা হত। উদাহরণ স্বরূপ গত মার্চ মাসে বেলুড়ে রামকৃষ্ণের ৭৯তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যায়। সংবাদে প্রকাশ যে (এতদুপলক্ষে) উপস্থিত বিশাল জনসমাবেশে পূর্বে উল্লিখিত অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী, মাখন সেন, যতীন্দ্র নাথ মুখার্জী ও বিপ্লবী দলের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের দরিদ্র নারায়ণ সেবা এবং অভ্যাগত দেখা শোনার কাজে মঠ কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে দেখা গিয়েছিল। অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী এই উপলক্ষে একদল স্বেচ্ছাসেবী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং মঠ-কর্তৃপক্ষের তরফে অগণিত অতিথিদের তত্ত্বাবধান করে সকলের বিলক্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাংলা দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য শাখাগুলিতেও ঐ রকম অনুষ্ঠান হত।

ঢাকাতে যে উৎসব হয়েছিল সেখানে সংকীর্ত্তন দল (সঙ্গীত সহযোগে নাচের দল) আনা হয়েছিল এবং সেটি গান গেয়ে শহরের পথ পরিক্রমা করে।

শোভাযাত্রাটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রায় ৫০০ জন ছাত্র ও যুবক এতে অংশ নিয়েছিল বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। (সংকীর্ত্তণের সময়) যাঁরা নেচে নেচে গাইছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আত্মসংযম হারিয়ে গায়ের উত্তরীয় খুলে ফেলেন এবং আরও অনেকে মূর্ছা যান। সংকীর্ত্তণের পরে যে যাত্রাঅভিনয় হয়েছিল সেখানে উৎসাহী শ্রোতাদের সম্মুখে 'আমার দেশ' এবং 'আমার জন্মভূমি' প্রমুখ প্ররোচনামূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

১১

রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান কর্মীবৃন্দ

এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট অংশে বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনে নিযুক্ত স্বামীজী এবং ব্রহ্মচারীগণের পূর্ণ তালিকা পেশ করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীজী এবং ব্রহ্মচারীগণের পূর্বাশ্রমের নাম ও ঠিকানা বর্তমানে যতটা জানা গিয়েছে তাও লিখে রাখা হয়েছে। এই রিপোর্টে এঁদের মধ্যে অনেকেরই নাম ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। স্বামীজীদের তালিকায় উল্লিখিত ২৫ নং ব্যক্তি হলেন সারদানন্দ তথা মঠের বর্তমান সেক্রেটারি সারদা চক্রবর্তী।[১০] তাঁর ভাই নরেশ চক্রবর্তী সম্পর্কে আমরা সম্প্রতি যে সংবাদ পেয়েছি তাতে জানা যায় যে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত রয়েছেন।

আমেরিকাতে দীর্ঘ দিন বসবাস করার পর এই ভদ্রলোক সম্প্রতি ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন। শোনা যায় যে আমেরিকাতে অবস্থানকালে নিতান্ত উৎকট ধরনের চরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল।

মনে হয় নরেশ এবং সুরেন্দ্র উভয়েই আমেরিকার 'হিন্দুস্থান এ্যাসোসিয়েসন' এর প্রতিনিধি হিসেবে নিকট প্রাচ্য, আমেরিকা এবং ইউরোপ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁরা প্যারিসের সুপরিচিত ভারতীয় বিপ্লবী (firebrands) মাদাম কামা (Madame Cama) এবং কৃষ্ণ বর্মার সংস্পর্শেও এসেছিলেন। ইউরোপে অবস্থান করার সময় নরেশ নাকি স্বীকার করেছিলেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দুস্থান এ্যাসোসিয়েসনের শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীগুলি আসলে নিতান্তই ছুতো, ভারতবর্ষে বিপ্লব সাধনই ছিল এটির মূল উদ্দেশ্য।

নরেশ এবং সুরেন্দ্র বসু কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে তাঁদের তল্পি-তল্পা

তল্লাসী করা হয় এবং শেষোক্ত জনের বাক্সের মধ্যে কিছু কিছু আধা-প্ররোচনা-মূলক পুস্তিকাও খুঁজে পাওয়া যায়।

সারমর্ম

আগেকার আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, অতীতে ধর্ম এবং সেবামূলক কাজের আড়ালে রামকৃষ্ণ মিশনকে যে বিপ্লবে ইন্ধন যোগানোর কাজে ব্যবহার করা হত সে সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ রয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অবশ্য সব চেয়ে বড় বিপদ দেখা দিচ্ছে অননুমোদিত আশ্রমগুলি থেকে, যেগুলি বেলুড়ে মিশনের প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই তাঁদের অগোচরে পূর্ব বাংলার দুর্গত এলাকা সমূহে ব্যাঙের ছাতার মত দ্রুত গজিয়ে উঠছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-গুলি দিগ্বিদিকে প্রচার করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দই ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর সেই আদেশ বাংলার বিপ্লবীরা এমন চমৎকার ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন যে এখন মিশন কর্তৃপক্ষের হাজার সদিচ্ছা সত্ত্বেও সেগুলিকে আর সংযত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ স্বামীর সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎকারের সময় ইতিপূর্বে কথিত এই সব ঘটনা সংক্ষেপাকারে জানানোও হয়েছিল। তিনি এ কথা স্পষ্ট স্বীকারও করেন যে বিবেকানন্দের শিক্ষানীতির কিছু কিছু অংশ বিপ্লব আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু এই রকম সম্ভাবনার কথা স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং চিন্তা করেছিলেন বা তিনি নিজেই এটা চেয়েছিলেন, এ রকম কিছু সারদানন্দ স্বীকার করেননি।

পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলের এই সব রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাহায্যে কি পরিমাণে বিপ্লবের প্রচার কাজ চালানো হয়েছিল সে বিষয়ে অবশ্য তিনি আগে থেকে কিছু জানতে পারেন নি। তবে মঠের শিক্ষাদর্শসমূহের এরূপ বিপজ্জনক বিকৃত সাধন যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে মঠের অস্তিত্বই যে সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে সে বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ খেয়াল রয়েছে। তাঁকে বোঝানো হয় যে (এমতাবস্থায়) তাঁর উচিত, জন সমক্ষে এবং বেলুড় ও অন্যান্য অনুমোদিত শাখা কেন্দ্রগুলি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জনসমাবেশে ও সংবাদ পত্রে এ কথা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করা যে, এই সব ভুয়ো আশ্রমগুলির সঙ্গে মিশনের কোন সম্পর্ক নেই। এই রকম অনুরোধের ফলে এপ্রিলের গোড়ার দিকে বাংলা দেশের সব কা

প্রধান পত্রিকায় সারদানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত সাবধান বাণীটি প্রচারিত হয়েছিল।[১১]

রামকৃষ্ণ মিশন

জন সাধারণের উদ্দেশ্যে একটি সতর্ক বার্তা

পূর্ব বাংলার কয়েকটি সাম্প্রতিক মামলার সুবাদে যে সব তথ্য জানা গিয়েছে তা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালক মণ্ডলী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কয়েকটি সংগঠন, দলের সদস্যবৃদ্ধি এবং নিজেদের দুরভিসন্ধিমূলক মতবাদ, এমন কি কখনও কখনও অপরাধমূলক প্রচার কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে মিশন এবং বেলুড় মঠের সুনামকে কাজে লাগাচ্ছেন। পরিচালক মণ্ডলী তাই মনে করেন যে জনসাধারণ এবং বিশেষ করে বাংলা দেশের সরল যুব সম্প্রদায়কে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ যাঁদের মূল কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠে এবং যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের মহান নেতৃত্ব লাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা সর্ব্বৈব একটি ধর্মীয় সংস্থারই অন্তর্ভুক্ত এবং কোন ধরণের রাজনীতি বা বেআইনী সংগঠন সমূহের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। জীব ব্রহ্মৈব নাপরা—অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দেবতার প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রবচন মেনে নিয়ে এই সম্প্রদায় জন্মমুহূর্ত থেকেই সাধ্যমত শিব জ্ঞানে জীব সেবা এবং সেই সঙ্গে ধর্মীয় কৃষ্টির প্রচার ও বেদান্তের শাশ্বত দর্শন উপলব্ধি করার ব্রতে নিযুক্ত রয়েছে। এই সেবা ধর্ম পালনের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের জন সাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই ভাবে মানুষের কল্যাণ ও হিতৈষা কর্ম সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই রামকৃষ্ণ মিশন গঠন করা হয়। অতএব এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, কোন ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন রকম সম্পর্ক থাকতেই পারেনা। রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় লালিত, মিশন বিশ্বাস করে যে, ধর্ম এবং ব্রহ্মোপলব্ধির ভিত্তিতে চরিত্র গঠনের মাধ্যমেই এক মাত্র, বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণ সম্ভব হতে পারে, রাজনীতির পথে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ভারত আত্মার পুনর্বিকাশই প্রতিটি ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত এবং এই বিশ্বাসেই মিশন জাতীয় কংগ্রেস, উগ্রপন্থী দল এবং অন্যান্য নিয়মিত বা অনিয়মিত রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির কর্মসূচী থেকে নিজেদের দূরত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। রাজনীতি নয়, ভারতের অধ্যাত্ম

চেতনার মধ্যেই ভারতবাসীর প্রাচীন ঐতিহ্য নিহিত রয়েছে। রামকৃষ্ণ এবং তদীয় শিষ্য বিবেকানন্দ, প্রেম, মৈত্রী এবং শান্তির মাধ্যমে সেই ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার শিক্ষা দিয়ে যান এবং তদবধি মিশন সেই আদর্শ অনুযায়ীই পরিচালিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ ও বেলুড় মঠের নামে ভবিষ্যতে কেউ যদি কোন যুবকের কাছে কোন রকম রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থিত হন তাহলে তিনি স্বচ্ছন্দেই তাদের ভেকধারী প্রতারক বলে ধরে নিতে পারেন। এই সব লোকেরা নিজ নিজ গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই মিশনের সুনামকে অপব্যবহার করতে উদ্যত হয়েছে। এই সকল যুবকেরা যদি সত্যিই মিশনের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে চান তাহলে তাঁরা সহজেই মিশনের মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু মিশনের উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁরা যেন কখনও এই সব সন্দেহজনক ব্যক্তিদের মারফত কোন তথ্য সংগ্রহ না করেন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই সকল যুবকের কাছে যাঁরা উপস্থিত হবেন তাঁদের কাছ থেকে কিছু শুনবার আগেই যুবকেরা মিশনের সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পত্রালাপ করে এরা যথার্থই মিশনের সঙ্গে যুক্ত ধর্মপ্রচারক কিনা, সে বিষয়ে সব কিছু জেনে নিতে পারেন। মিশন জনকল্যাণমূলক কাজের প্রয়োজনে যাঁদের অর্থ সংগ্রহে পাঠায় তাঁদের সকলের কাছেই মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্রের বিশেষ শিলমোহর করা পরিচয় পত্রও দেওয়া হয় এবং চাঁদা দেওয়ার আগে জনসাধারণ যেন অবশ্যই এগুলি যাচাই করে দেখে নেন।

দ্বিতীয় আর একটি বিষয়ে আমরা জনসাধারণকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতে চাই যে, তাঁরা যেন রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে যুক্ত যে কোন সংগঠন বা সেবাশ্রমকে নির্বিচারে বেলুড় মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আশ্রম বলে মনে না করেন। সেবাব্রতের যে মহান আদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন তার ফলে স্বদেশ ও বিদেশের সর্বত্র তাঁরা সমাদর লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের দু জনের নাম নিয়ে এখন দেশের চারিদিকে বহু সংখ্যক সংগঠন, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কারখানা, দোকান, ঔষধ বিপনী, ট্রেড মার্ক ইত্যাদি নানা রকমের ভাল ও মন্দ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ভাল লোকেরা সেবাব্রতের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁদের নাম ব্যবহার করে আর মন্দ লোকেরা তাঁদের নামের সুযোগ নিয়ে জনসাধারণের বিশ্বাস সৃষ্টি করে নিজ নিজ অসাধু উদ্দেশ্য সাধন করে। অতএব জনসাধারণের এ কথা

জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে রামকৃষ্ণ মিশন শুধু সেই সকল সংগঠন, আশ্রম বা সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকেই তার শাখা সংগঠন হিসাবে গণ্য করে যেগুলির নামের সঙ্গে 'রামকৃষ্ণ মিশন' কথা কয়টি যুক্ত আছে। এই নামটি ব্যবহারের সুযোগ নিতে হলে ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে মিশনের মূল কেন্দ্রের কাছে আবেদন করে অনুমতি নিতে হয় এবং এই প্রসঙ্গে এখানে জানিয়ে রাখা যায় যে, রামকৃষ্ণ মিশনের বরিশাল শাখাটিকে বাদ দিলে, গোটা বাংলা দেশে আমাদের অন্য কোন অনুমোদিত শাখা কেন্দ্র নেই। অবশ্য বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কয়েকটি সংগঠন এবং আশ্রম অনুমোদন লাভ করবার জন্য আমাদের কাছে আবেদন জানাবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। জনসাধারণের এই সমস্ত কথা খেয়াল রেখে সেই মত ইতিকর্তব্য স্থির করা উচিত। পরিশেষে আমাদের সনির্বন্ধ প্রার্থনা যে, জনসাধারণ নিজেদের এবং সেই সঙ্গে মঠ ও মিশনের স্বার্থ ও নিরাপত্তার খাতিরে যেন উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে যথাবিহিত সতর্কতা অবলম্বন করেন।

আপনাদের···ইত্যাদি

সারদানন্দ

সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

শুরুতে যেমন বলা হয়েছিল, এই প্রতিবেদনে মূলত মিশনের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কেই মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং মিশনের বিরুদ্ধে বক্তব্যগুলিও ক্রমানুসারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর ফলে হয়ত অসাবধানতা-বশতঃ এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে মনে হতে পারে যে মিশনের কর্মপ্রণালীর আরও একটি দিক অর্থাৎ কোন উজ্জ্বল দিক বলতে কিছুই নেই। এই রকমের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা যেতে পারে যে রামকৃষ্ণ মিশন যা হতে চেয়েছিল তা না হয়ে সে যে অন্য কিছু হয়েছে এমন কথা কখনও বলা হয়নি। (প্রকৃত পক্ষে) এটি এমন একটি ধর্মীয় সংস্থা যা সীমিত ভাবে, নিঃসন্দেহে সংকটের সময় ত্রাণ বিতরণে প্রভূত পরিমাণে কাজ করে এসেছে এবং পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন সেবাশ্রমের মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে সকল সময়েই বিনা ব্যয়ে চিকিৎসারও ব্যবস্থা করে এসেছে।

সম্ভবত দু একজন ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে স্বামীজীরা কেউ-ই নিজেদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন নি। রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন

ব্যক্তিদের মিশন থেকে অপসারিত করার জন্য তাঁরা সকলে উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করেছেন এবং সম্প্রতি, সম্ভবত পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কিম্বা মঠের আড়ালে থেকে নিজেদের কার্য সিদ্ধি করার জন্য মিশনে যোগদানেচ্ছু বিপ্লবী দলের তিন জন সদস্যকে মঠে প্রবেশাধিকার না দিয়ে তাঁরা এ বিষয়ে তাঁদের সদিচ্ছারও প্রমাণ দিয়েছেন। মিশনে যোগদানে ইচ্ছুক সদস্যগণের নিকট ১৯১১ সাল থেকে যে ঘোষণা পত্র আদায় করা হত তার থেকেও প্রমাণ হয় যে মঠের কর্তৃপক্ষ বিপ্লবীদের সম্পর্কে কি পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। "আমি ঘোষণা করছি যে আমার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক বা কোন গুপ্ত দলের কোন রকমের সম্পর্ক নেই" এই মর্মে উক্ত ঘোষণাপত্রে আবেদনকারী (ইচ্ছুক সদস্যকে) স্বাক্ষর দিতে হত।

অপর পক্ষে এটাও দেখানো হয়েছে যে মঠের সাধারণ কর্মীবৃন্দ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কলুষ মুক্ত ছিলেন না। এই প্রতিবেদনটি রচনা করার মুহূর্তে রীতিমত অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করা হয়েছিল যে সারদানন্দের ভাই নিজেও একজন সক্রিয় এবং বিপজ্জনক বিপ্লবী। আরও দেখানো হয়েছে যে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষানীতির বেশ কিছু অংশ রাজদ্বেষে পূর্ণ, এবং সেগুলির অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতা সম্পর্কে বিপ্লবী দল পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিল এবং তারা সে সবের সুযোগও নিয়েছিল। তাছাড়া রাজনৈতিক কারণে পলাতক ব্যক্তিরাও বিভিন্ন অনুমোদিত মঠে এসে আশ্রয় গ্রহণ করত। পূর্ব বাংলার সর্বত্র আশংকাজনক ভাবে দ্রুত গতিতে ভুয়ো আশ্রমগুলি গজিয়ে ওঠে এবং সেগুলি সবই ছিল আদর্শ প্রচারের কেন্দ্রস্থল।

মনে হয় বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ এখন আগামী দিনের বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হয়েছেন এবং তাঁদের শিক্ষানীতিগুলির বিকৃতি সাধন যথাসম্ভব রোধ করার জন্য তাঁরা আগ্রহীও হয়েছেন। এটি তাঁরা কি ভাবে সমাধা করবেন সে বিষয়ে মত-বিরোধ থাকতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, সারদানন্দ একদা এই মত মন্তব্য করেন যে, সরকার এক বিশাল শক্তি ও সংগঠনের অধিকারী হয়েও যখন নিজেই এই সকল বিপ্লববাদী ক্রিয়াকর্ম দমনে অপারগ তখন মিশনের গুটি কয় সন্ন্যাসীই বা সেই বিপুল জোয়ার কি ভাবে ঠেকিয়ে রাখবেন? যাহোক অনুসন্ধানের ফলে এটা কিন্তু জানা গিয়েছে যে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ব্যবহার করেই বিপ্লবী দলে অতীতে সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এই সদস্যগণের অনেকের মধ্যেই প্রথম প্রথম এই ধারণা ছিল যে তারা রামকৃষ্ণ মিশনেই যোগ

দিতে চলেছে। এইভাবে সকলের অলক্ষ্যে বিষ সংক্রমিত করা হয়েছে এবং দলের যথার্থ স্বরূপ যখন শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে তখন তারা সকলেই দলের উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর এবং সচেষ্ট হয়ে ওঠে। বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ এটা সহজেই বন্ধ করতে পারেন যদি তাঁরা সকল প্রকারের রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কশূন্যতার কথা মাঝে মধ্যেই জনসমক্ষে ঘোষণা করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারায় কলুষিত যে সব ব্যক্তি রয়েছেন তাঁদেরও বহিষ্কার করেন।

সি. এ. টেগার্ট

কলিকাতা — স্পেশাল সুপারিনটেনডেনট অফ পুলিশ,

২২শে এপ্রিল ১৯১৪ — ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ

সংযোজনী

এই প্রতিবেদন যখন প্রেসে পাঠানো হয় সেই সময় আরও অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে পূর্বে উল্লিখিত প্রিয়নাথ দাস ওরফে সুরেন্দ্র, ওরফে বীরেন্দ্র, এবং ফরিদপুরের কামারপুর নিবাসী প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাস যে সময় সাজা পান তার অনেক আগেই এই প্রিয়নাথ, পুলিন দাস ও অমৃত হাজরার দলে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রিয়নাথের বসন্ত নামে যে ভাইটি এখন কলকাতায় রয়েছেন, তিনিও 'যুগান্তর' দলের একজন সদস্য। মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বারীণ ঘোষের সাজা হওয়ার পর তাঁর অনুগামীরা এই 'যুগান্তর' দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পরিশিষ্ট

রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান কর্মীবৃন্দ

স্বামীজীগণ

নিম্নে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত বর্তমান স্বামীজী এবং ব্রহ্মচারীগণের একটি পূর্ণ তালিকা সন্নিবেশিত হল। এগুলি মঠের কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে।

১ **অভেদানন্দ :** কালীচাঁদ চন্দ্র, কলকাতার আহিরীটোলা নিবাসী বি. এল চন্দ্র (ক্রীশ্চান) এর ভাই। ১৮৮৪ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে নিউইয়র্কের নিকট একটি কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছেন।

২ অচলানন্দ : কেদার ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম জানা যায় নি, বেনারসের অধিবাসী ১৯০১ অথবা ১৯০২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন।

৩ অদ্ভুতানন্দ : লাটু মহারাজ, ছাপরার একটি গ্রামের অধিবাসী। ১৮৮৪ সালের কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বেনারসে একটি ভাড়া বাড়ীতে বাস করছেন।

৪ অখণ্ডানন্দ : গঙ্গাধর ব্যানার্জী, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের বাসিন্দা, কলকাতা পুরসভার আলোক (বিভাগের) পরিদর্শক হরিদাস ব্যানার্জীর ভাই। ১৮৮৩ সালের কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার সরগাছি অনাথ আশ্রমের দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন।

৫ অম্বিকানন্দ : নীরদবিহারী ঘোষ, হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরবাসী গোপাল ঘোষের পুত্র। সম্ভবত ১৯০৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠেই আছেন।

৬ আত্মীয়ানন্দ : মালদা জেলার স্কুল ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম জানা যায়নি। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন, এখন বেনারস মঠে রয়েছেন।

৭ বীরজানন্দ : বেলেঘাটার নারকেলডাঙা অঞ্চলের কালীকৃষ্ণ বসু। ডাঃ কৈলাশ বসুর পুত্র। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মায়াবতী আশ্রমের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন।

৮ বিশুদ্ধানন্দ : জীতেন্দ্রনাথ, ২৪ পরগণা অথবা হুগলি (জেলার) কায়স্থ। পারিবারিক নাম জানা যায়নি। ১৯০৫ কিংবা ১৯০৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বাঙ্গালোর মঠে আছেন।

৯ বোধানন্দ : হরিপদ চ্যাটার্জী, হুগলির তারকেশ্বরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের বাসিন্দা। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে নিউ ইয়র্ক কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত।

১০ ব্রহ্মানন্দ : (রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট), বসিরহাট নিবাসী রাখাল দাস ঘোষ। ১৮৭০ সালের কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি মিশনের কনখল শাখা কেন্দ্রে

রয়েছেন। খবর পাওয়া গিয়েছে যে পূর্বে উল্লিখিত অবনীন্দ্র নাথ ঘোষও এঁর সঙ্গে (এই স্থানেই) বাস করছেন।

১১ ধীরানন্দ : কলকাতার আহিরীটোলা নিবাসী ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম জান যায়নি। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। সম্প্রতি ঢাকায় (কার্যোপলক্ষে) ভ্রমণরত।

১২ গিরিজানন্দ : পূর্ববঙ্গের কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত, ১৯০৪ অথবা ১৯০৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। তমলুক এবং কাঁথিতে বন্যা ত্রাণ দলের সঙ্গে কাজ করেন। বর্তমানে বেনারস মঠে রয়েছেন।

১৩ গোকুলানন্দ : প্রিয় নাথ, পূর্ব বঙ্গ নিবাসী কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত। ১৯০৪ কি ১৯০৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। সম্প্রতি তমলুক এবং কাঁথিতে বন্যা ত্রাণ কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখন বেলুড় মঠেই রয়েছেন।

১৪ কল্যাণানন্দ : পূর্ববঙ্গের গুহ, ১৮৯৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে কনখল সেবাশ্রমের (হাসপাতাল) দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন।

১৫ কর্মানন্দ : উপেন্দ্র, পূর্ববঙ্গের কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত, ১৯০৪ অথবা ১৯০৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। তমলুক এবং বাঁকুড়া জেলার কোতলনারায়ণপুরের বন্যা ত্রাণে কাজ করেন। এখন মায়ের সঙ্গে উত্তর ভারতে তীর্থ ভ্রমণে রত।

১৬ মহিমানন্দ : মহীতোষ মিত্র, নিবাস : শ্রীপুর, নদীয়া। ১৯০৩ অথবা ১৯০৪ এ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠেই রয়েছেন।

১৭ নির্ভয়ানন্দ : কানাইলাল স্বর্ণবণিক, নিবাস : আহিরীটোলা। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। উড়িষ্যার কোতর-এ বায়ু পরিবর্তনে গিয়েছেন।

১৮ নির্মলানন্দ : বোসপাড়া লেন নিবাসী তুলসী চরণ দত্ত। ১৮৮৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বাঙ্গালোর কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত। ১৯০৭ সালে বেলুড় মঠ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে

তিনি সে সময় কলকাতার অনুশীলন দলের সদস্যগণের কাছে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯ নিশ্চয়ানন্দ : ইনি মারাঠী, ১৮৯৮ অথবা ১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে কনখল সেবাশ্রমে রয়েছেন।

২০ পরমানন্দ (১) : বসন্ত সেন, নিবাস : পূর্ব বঙ্গ, ১৮৯৩/৯৪ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে আমেরিকার বোস্টন কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন।

২১ পরমানন্দ (২) : নাম জানা যায় নি, কায়স্থ, রাখাল মহারাজ (৭নং) এর আত্মীয়। ১৯০৪/১৯০৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন, বর্তমানে মায়াবতীর অদূরে টনকপুরে রয়েছেন।

২২ প্রকাশানন্দ : কলকাতার বউবাজারে ন্যাড়াগীর্জার বাসিন্দা, সুশীল কুমার চক্রবর্তী। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন আমেরিকার স্যান ফ্রান্সিসকো কেন্দ্রে রয়েছেন।

২৩ প্রেমানন্দ : রাম ঘোষ, নিবাস : আঁটপুর, তারকেশ্বর, হুগলি। ১৮৮২/ ১৮৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে ময়মনসিংহে ভ্রমণরত। রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষ।

২৪ পূর্ণানন্দ : আহিরীটোলার আশুতোষ সুবর্ণবণিক। ১৯১০/১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসাবে কাঁথিতে বন্যাত্রাণ দলের সঙ্গে চিকিৎসা কাজে রত।

২৫ সচ্চিদানন্দ : দীননাথ সেন, ডাক নাম বুড়োবালিয়া, নিবাস : পূর্ববঙ্গ। ১৮৯১/৯২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠেই রয়েছেন।

২৬ সান্ত্বনানন্দ : খগেন্দ্র নাথ ময়রা, নিবাস : হুগলি জেলা, ১০০৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বেনারস মঠে আছেন।

২৭ সারদানন্দ : শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, নিবাস : ৩৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা। ১৮৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি এবং বাগবাজার মঠের ভারপ্রাপ্ত। তাঁর ভাই নরেশ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[১২]

২৮ শঙ্করানন্দ : অমূল্য চন্দ্র গুপ্ত, নিবাস : শাস্তি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলকাতা, ১৯০৫-১৯০৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বেনারসের মঠে আছেন।

২৯ সর্বানন্দ : ডাক নাম তেজনারায়ণ (প্রকৃত নাম অজ্ঞাত), নিবাস : বেনারস। ১৯০৭-১৯০৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মাদ্রাজ কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত।

৩০ শিবানন্দ : ২৪ পরগণার বারাসাত নিবাসী তর্কনাথ ঘোষাল। ১৮৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন আলমোড়ায় আছেন।

৩১ সুবোধানন্দ : কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনের সুবোধ চন্দ্র ঘোষ। ১৮৮৪-১৮৮৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে আছেন। সম্প্রতি রাঁচি ঘুরে এলেন।

৩২ সুধানন্দ : সুধীর চন্দ্র চক্রবর্তী, সুশীল (২২নং) এর ভাই। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মাদ্রাজ কেন্দ্রে রয়েছেন।

৩৩ ত্রিগুণাতীর্থ : সারদা প্রসন্ন মিত্র, নিবাস : কলকাতার নন্দনবাগান। ১৮৮৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে স্যান-ফ্রান্সিসকো কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত।

৩৪ তুরীয়ানন্দ : হরিপদ চ্যাটার্জী, নিবাস : বোসপাড়া লেন, কলকাতা। ১৮৮৫-১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে দেরাদুন অথবা হৃষিকেশে (অবসরপ্রাপ্ত) রয়েছেন। এখন আর মিশনের কোন কাজ করেন না।

৩৫ বিজ্ঞানানন্দ : হরিপ্রসন্ন চ্যাটার্জী, নিবাস : বেলঘরিয়া। পুনা থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন। বর্তমানে এলাহাবাদ মঠের দায়িত্ব প্রাপ্ত। (ইনিই বেলুড় মঠের স্থপতি)

ব্রহ্মচারিগণ

১ অতুলকৃষ্ণ দত্ত : নিবাস : কলকাতার রামবাগান। ১৯০২ সালের কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে থাকেন।

২ বিশ্বরঞ্জন বসু : নিবাস : ঢাকা। ১৯০৪/১৯০৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেনারসের মঠে বাস করছেন।

৩ চন্দ্রনাথ : ২৪-পরগণা জেলায়, সোনারপুর পুলিশ থানার অন্তর্গত নিকটবর্তী রাজপুর গ্রামের অধিবাসী, কায়স্থ, ১৯০৩/১৯০৪ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেনারসের মঠে বাস করছেন।

৪ চারু চন্দ্র দাস : নিবাস : ডাফ্ ষ্ট্রীট, কলকাতা। ১৮৯৯/১৯০০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। মিশনের সহকারী সেক্রেটারী, এখন বেনারস মঠে বাস করেন।

৫ গণেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী : নিবাস : বাগবাজার, কলকাতা। ১৯০২-১৯০৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বাগবাজার মঠে (উদ্বোধন কার্যালয়) বাস করছেন।

৬ হরেন্দ্র নাথ : কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত। স্বামী বিবেকানন্দের আত্মীয়। ১৯০১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

৭ জ্ঞান ব্যানার্জী নিবাস : ২৪-পরগণার বরানগর। ১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বেলুড় মঠে বাস করেন।

৮ জ্ঞানদানন্দ দাশগুপ্ত নিবাস : বরিশাল, ১৯০৭-১৯০৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে কাঁথিতে বন্যা ত্রাণ দলের সঙ্গে কাজ করছেন।

৯ বিলাস চক্রবর্তী নিবাস : ঢাকা, ১৯০৬-১৯০৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বাগবাজার মঠে রয়েছেন।

১০ নির্মল চন্দ্র বসু নিবাস : নদীয়ার শান্তিপুরের নিকটবর্তী একটি স্থান। ১৯১০-১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বাগবাজার মঠে বাস করছেন।

১১ প্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্তী ৩৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা, নিবাসী স্বামী সারদানন্দের ভাই। ১৯১১-১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেনারসের মঠে বাস করেন।

১২ পঞ্চানন : কলকাতা নিবাসী ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত। ১৯০৬-১৯০৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন এলাহাবাদের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বাস করছেন।

১৩ দেবব্রত বসু নিবাস : ৫৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলকাতা। বর্তমানে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে বাস করছেন।

১৪ সদ্বন্ধু ভট্টাচার্য নিবাস : কুমিল্লা, ১৯০৫-১৯০৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন মাদ্রাজে মঠে বাস করছেন।

১৫ রাস বিহারী মিত্র নিবাস : কৃষ্ণকাটি, পূর্ব বঙ্গ। ১৯১০-১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে তীর্থ ভ্রমণে রত।

১৬ শচীন্দ্র কুমার সেন নিবাস : সোনারঙ, ঢাকা। এখন রাঁচিতে আছেন।

১৭ সুধা চৈতন্য : মেদিনীপুরের গাঁতাল নিবাসী ব্রাহ্মণ। ১৯১১-১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বন্যা ত্রাণ দলের সঙ্গে কাজ করেছেন। এখন বেলুড় মঠে রয়েছেন।

১৮ অতুল চন্দ্র বসাক নিবাস : পাবনা, ১৯০৯-১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেনারস মঠে বাস করছেন।

১৯ চারু চন্দ্র বসু নিবাস : মেদিনীপুর। ১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বেলুড় মঠে আছেন।

২০ নরেন্দ্র নাথ মিত্রঃ নিবাস : জনাইবক্ষ, হুগলি। ১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে আছেন।

২১ প্রভাস চন্দ্র চ্যাটার্জী নিবাস : হুগলি, ১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছেন।

২২ অতুল চন্দ্র গুহ নিবাস : ঢাকা, ১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন, এখন মায়াবতী আশ্রমে আছেন। এই ব্যক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে।

২৩ যতীন্দ্র নাথ মেদিনীপুরের কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত। ১৯১১-১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে আছেন।

২৪ অশোক কৃষ্ণ দেব কলকাতার শোভাবাজার রাজপরিবারের সন্তান, ১৯১১-১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। সম্প্রতি হরিদ্বারে তীর্থ ভ্রমণে রত।

২৫ সীতাপতি ব্যানার্জী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হীরালাল ব্যানার্জীর পুত্র। ১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মায়াবতী আশ্রমে বাস করছেন।

২৬ সুরেশ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য নিবাস: পূর্ব বঙ্গ। ১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মাদ্রাজের মঠে রয়েছেন।

অবেক্ষাধীন

১ শ্যামাচরণ: ঢাকার বীরগাঁ নিবাসী ব্রাহ্মণ। এখন তীর্থ ভ্রমণে রত।

২ সতীশ চন্দ্র: বরিশালের কায়স্থ, ১৯০৫ অথবা ১৯০৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে তীর্থ ভ্রমণ কাজে রত।

৩ সীতারাম: নিবাস: মাদ্রাজ, ১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমান ঠিকানা অজ্ঞাত।

৪ নলিনী কান্ত দেব কলকাতার মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটের বাসিন্দা। ১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন দেরাদুনে আছেন।

৫ বীরেন্দ্র নাথ: নিবাস: পূর্ব বঙ্গ। এঁর পারিবারিক নাম জানা যায় নি। ইনি অপ্রকৃতিস্থ মনের মানুষ বলে সর্বসাধারণের বিশ্বাস।[১৩]

৬ উমাপদ: বীরভূম নিবাসী বৈশ্য। ১৯১১ সালে (রামকৃষ্ণ মিশনে) যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে রয়েছেন।

৭ প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত নিবাস: পূর্ব বঙ্গ। ১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বাগবাজার মঠে রয়েছেন।

B. S. Press—12. 5. 1914—39x—100-H. C. and G. H. R.

তথ্যসূত্র

(১) টেগার্ট শ্রীরামকৃষ্ণেরজন্ম সন সম্পর্কে ভুল হিসেব দিয়েছেন। প্রকৃত জন্ম সন ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।

(২) জয়রামপুর নয়, হুগলি জেলায় অবস্থিত জয়রামবাটি গ্রাম।

(৩) প্রকৃত পক্ষে এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তেইশ এবং সারদামণির নিজের বয়স পাঁচের কাছাকাছি।

(৪) বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নানা ধরনের বিপ্লবী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাইরন ফেল্‌পসের সহযোগিতায় "ইণ্ডো-আমেরিকান ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েসান" নামে এই রকম একটি সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে এই সমিতি "সোসাইটি ফর দি এ্যাডভান্সমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া" নামে পরিচিতি লাভ করে—আমেরিকার শিকাগো ও ডেট্রয়েট শহরে এই সমিতির একাধিক শাখা স্থাপন করা হয়েছিল।

(৫) প্রকৃত নাম সারদা প্রসন্ন মিত্র (১৮৬৫-১৯১৫)। সন্ন্যাস গ্রহণের পর এঁর নাম হয় ত্রিগুণাতীতানন্দ।

(৬) এই অংশের অনুবাদ মূল রচনা অর্থাৎ 'বর্তমান ভারত' এর 'ইংলণ্ডের ভারতাধিকার' শীর্ষক অংশটুকু থেকে নেওয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য: **স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা**, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃঃ ২২৮-২৯

(৭) ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য।

(৮) টেগার্ট লিখেছেন: "Yet a time will come, when there will be the rising of the Sudra class, with their Sudrahood ; that is to say, not like that as at present, when the Sudras are becoming great by acquiring the characteristic qualities of the vaisya or the kshatriya, but a time will come, when the Sudras of every country with their inborn Sudra nature and habits not becoming in essence vaisya or kshatriya but remaining as Sudras,—will gain absolute supremacy in every society." লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে টেগার্ট মূলের অনুবাদে যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন।

(৯) এই অংশটুকু লেখক নিজে অনুবাদ করেছেন। কেননা টেগার্ট এইখানে "India is slowly and gently awakening from her long deep sleep", ইত্যাদি বাক্যটি স্বামীজী কর্তৃক উচ্চারিত হয়েছে বলে দাবী

করলেও, মূল 'বর্তমান ভারত' শীর্ষক প্রবন্ধের কোথাও এই ধরনের উক্তি বর্তমান লেখকের চোখে পড়েনি। এই রকম্ আরো কয়েকটি উদাহরণ টেগার্টের রিপোর্টে ইতস্তত খুঁজে পাওয়া যায়।

(১০) টেগার্ট এখানে ভুল নম্বর উদ্ধৃত করেছেন। পরিশিষ্টাংশে স্বামীজীদের তালিকায় ২৭ নম্বরে সারদানন্দের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

(১১) এই বিবৃতিটি সেকালের ইংরাজী কাগজ *Englishman* এ, ১৯১৪ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

(১২) লক্ষ্য করার বিষয় ১৮৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিতই হয়নি। এই তালিকার নানা স্থানে এই রকম ভুল রয়ে গিয়েছে। সন্ধানী পাঠকগণ প্রেমানন্দ, সচ্চিদানন্দ, শিবানন্দ, সুবোধানন্দ প্রভৃতির মিশনে যোগ দেওয়ার তারিখগুলি খতিয়ে দেখতে পারেন।

(১৩) মূল রিপোর্টে এঁর নামের পাশে প্রথম বন্ধনীতে mad শব্দটি ছাপান হরফে লেখা ছিল। পরে সেটি হাতের লেখায় কেটে দিয়ে সেই জায়গায় behiened to be of unsound mind মন্তব্যটি জুড়ে দেওয়া হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

কার্মাইকেলের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করে টেগার্ট যে গোপন রিপোর্টটি পেশ করেছিলেন তা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে হয়ত যথেষ্ট ভাবে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু যত যা-ই হোক মিশনের বিরুদ্ধে এ তাবৎকাল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে কোন অভিযোগ আনতে সাহস করেন নি। অভিযোগগুলি প্রধানত পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগের গোপন ফাইলেই নথিভুক্ত করে রাখা হত। মিশনের ধর্মীয় চরিত্র এবং জনপ্রিয়তার কথা মনে করেই হয়ত কর্তৃপক্ষ এটিকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করা সঙ্গত হবেনা বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু এই মনোভাব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯১৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার রাজভবনে আয়োজিত দরবার বক্তৃতায় সর্বপ্রথম মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ আনা হয়। বক্তৃতা করেন বাংলার গভর্নর কার্মাইকেল (Lord Carmichael : 1912-16)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জনিত অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য যে ভারতরক্ষা আইন পাস করা হয়েছিল (১৮ মার্চ ১৯১৫) তার সপক্ষে যুক্তি বিস্তার করাই ছিল দরবার বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য এবং সেই আলোচনা প্রসঙ্গে কার্মাইকেল মিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি কতকগুলি অভিযোগ দায়ের করেন। এই সব অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মিশন কর্তৃপক্ষও লিখিত ভাবে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। এইভাবে অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগের মহড়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই রীতিমত উত্তেজনা বোধ করেন।

কার্মাইকেলের বক্তৃতায় ভারতরক্ষা আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন কেন দেখা দিয়েছিল তা জানতে হলে সে সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারতবাসীগণের তরফে রাজশক্তিকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করা হয়। কিন্তু তাই বলে এ কথা ভাবার কোন কারণ নেই যে আপামর ভারতবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সাহায্যের কাজে এগিয়ে এসেছিল। পক্ষান্তরে দেশের অনেকেই যুদ্ধের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষকে আরও দ্রুত স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। "England's necessity is

India's opportunity"—এই ছিল এঁদের মূল নীতি এবং এই নীতি অনুসরণ করে এঁরা স্বদেশ ও বিদেশের সর্বত্র বিপ্লব আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল যে, তাঁরা ইউরোপ, আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে তুলে সেগুলির মাধ্যমে ভারত সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালিয়ে যাবেন। তাছাড়া স্বদেশে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁরা বিদেশ থেকে অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই নতুন কর্মসূচী অনুযায়ী জার্মানী, আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় একাধিক বিপবকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। বাংলা দেশেও এই সময় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের এক নতুন যুগ শুরু হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ সন্ত্রাসবাদী নেতৃবৃন্দ রাজশক্তির বিরুদ্ধে নতুন করে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। এঁদের পরিকল্পনা হল প্রথমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করে তুলবেন, তারপর পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত পুলিশ লাইন এবং ট্রেজারি যুগপৎ আক্রমণ করবেন। সব শেষে জার্মাণ অস্ত্রের সাহায্যে তাঁরা ইংরাজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলেও পরিকল্পনা করা হয়। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘটনা প্রমাণ করেছিল যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নতুন করে আবারও শুরু হতে চলেছে। এর পর উপর্যুপরি কয়েক বছর ধরে নানা ধরনের রোমাঞ্চকর ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ভি. জি. পিংলে, মিরাটের ক্যাভেলরি লাইনসে বোমা সমেত ধরা পড়লেন আর দূর পূর্ব ভারতে বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে ইংরাজের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়াই করতে গিয়ে ট্রেঞ্চে প্রাণ হারালেন যতীন্দ্রনাথ।

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই রাজশক্তিকে বেকায়দায় ফেলার জন্য যে রকম ব্যাপক প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তার ফলে সরকার দিশাহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতরক্ষা আইনটি জারি করে। ইংরাজের তরফে এই আইনটির যৌক্তিকতা সম্পর্কে নানা রকম সাফাই গাওয়া হলেও এটি প্রধানত ভারতবর্ষের বিপ্লববাদী কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। আইনের তিনটি প্রধান ধারা অনুযায়ী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে স্রেফ সন্দেহের বশেই তাঁরা যে-কোন ব্যক্তিকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করতে পারতেন এবং বিচারের প্রহসন

করে তথাকথিত অপরাধীকে যৎপরোনাস্তি শাস্তিও দিতে পারতেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে যদিও যুদ্ধজনিত অবস্থা মোকাবিলা করার জন্যই এই আইন রচিত হয়েছিল বলে দাবী করা হয়, তবুও এটি একই উদ্দেশ্যে রচিত খাস ইংল্যাণ্ডের Defence of the Realm Act-এর থেকে অনেক বেশী কঠোর ছিল এবং তুলনামূলক ভাবে এই আইনের দ্বারা ভারতবাসীদের উপর অধিকতর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।[১]

গোখেল প্রমুখ মডারেট নেতৃবৃন্দ এই আইনকে সমর্থন করলেও দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ এই রকম একটি কালা কানুনের দাপটে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে এই আইনের বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র অসন্তোষও প্রকাশ পেতে থাকে। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই কার্মাইকেলের দরবার বক্তৃতার আয়োজন করা হয় এবং বক্তৃতার অবকাশে এই আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নতুন করে নানা ধরনের যুক্তি ও প্রমাণ শ্রোতাদের কাছে পেশ করা হয়। বক্তৃতার দীর্ঘ গৌড়চন্দ্রিকা অংশটুকু শেষ করার পর কার্মাইকেল অবশেষে ভারত রক্ষা আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যটি অকপটে ব্যক্ত করেন :

"There are many people in Bengal—Englishmen as well as Indians—who hardly realize as they should that the Act, though due to the war and though passed mainly to meet evils arising of the war or connected directly with the war, was also passed in order to deal with a danger to society which existed in Bengal long before the war has even thought of by most people, and which may last and may even become worse, after the war is ended.[২]

অর্থাৎ, যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার কথাটা অজুহাত মাত্র। এই আইনের আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদীদের দমন করা। কার্মাইকেল সন্ত্রাসবাদীগণের ক্রিয়াকলাপগুলিকে নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধ বা ক্রাইম হিসাবে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, যদিও এই সকল ক্রাইমের কাজে যারা লিপ্ত তাদের অনেক খবরই পুলিশ জানে, তথাপি রাষ্ট্র ও জনসাধারণের স্বার্থে এদের সম্পর্কে সকল কথা আদালতে মামলা চলার সময়ে পুলিশ খোলাখুলি প্রকাশ করতে পারেনা। ফলে অনেক সময়ে আইনের নানা ফাঁক দিয়ে এরা রেহাই পেয়ে

যায় এবং এইভাবে ছাড়া পেয়ে যাওয়ার জন্য অপরাধমূলক কাজে এরা উত্তরোত্তর উৎসাহ বোধ করতে থাকে। এদেরই দমন করবার জন্য ভারতরক্ষা আইন বলবৎ করা হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদীগণের কর্মপ্রণালী এবং তাদের সংগঠনের ধারা সম্পর্কেও কার্মাইকেল একটি বিস্তৃত বিবরণী পেশ করেন। তিনি বলেন যে, এইসব রাজনৈতিক অপরাধের কাজে সাধারণত দুই ধরনের লোক লিপ্ত থাকে। একটি দল এই সকল গোপন সংগঠনগুলির মস্তিষ্ক হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ তারা নিজেরা সশরীরে কোন ঝুঁকির কাজ না নিয়ে দলের অন্যান্যদের দিয়ে সেই সব বিপজ্জনক কাজগুলি কি ভাবে করিয়ে নেওয়া যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রাখে। আর একটি দল, নেতাদের পরিকল্পনা মাফিক নিজেরাই এই সব বিপদ সংকুল কাজ সিদ্ধ করার জন্য কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণত ভাবপ্রবণ, অল্পবয়স্ক কিছু তরুণ এবং স্কুল কলেজের ছেলেরাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এই সব কাজে এগিয়ে আসে। এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়স ও স্থির মস্তিস্কের কিছু লোক আছেন যাঁরা বিপ্লবী দলে সদস্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন। স্কুল কলেজের শিক্ষক হিসাবে বা অন্য নানা রকম জনহিতকর কাজে যুক্ত থাকার দরুন এঁরা অপরিণত বয়স্ক বালক এবং তরুণদের মনে সব চেয়ে মোক্ষম ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে এঁরা ছেলেদের মধ্যে সহজেই মিশে যেতে পারেন। তারপর অবোধ ছেলেদের দেশপ্রেম, পরার্থপরতা এবং মহত্তর মানসিক বৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে এরা তাদের এমন সব হীন এবং জঘন্য কাজে জড়িয়ে ফেলে যে সেই পাপচক্র থেকে তারা আর কোনদিনই মুক্তি পায় না। দলের কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সব চক্রান্তকারী ব্যক্তিরা দেশের যুব শক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল পথে টেনে নিয়ে যায় এবং এর পরিণাম ভুগতে হয় সেই সব সরলমতি অবোধ বালক কিংবা তাদের অসহায় অভিভাবকদের যারা কোনভাবেই আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আগে থেকে কোন রকম সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে না।

কার্মাইকেল এই সব সদস্য সংগ্রহকারী দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বিষোদ্গার করেন। তিনি বলেন এই সব প্রাপ্তবয়স্ক নেতারাই দেশের আসল শত্রু এবং এদের সম্পর্কে দেশের সরলপ্রাণ অধিকাংশ নাগরিককে তিনি সতর্ক করে দেন। দেশবাসীর প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করার সূত্রেই

কার্মাইকেল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। দেশপ্রেমের ছল করে দেশের এই সব শত্রুরা কিভাবে কাজ করে তার বর্ণনা দিয়ে কার্মাইকেল মন্তব্য করেন :

In attaining their aim they use terrorism as well as persuasion, and I feel certain, I am sorry to say, that they often seize the opportunity which membersip in a charitable society like the Ramakrishna Mission or participation in the relief of distress give them to meet and to influence boys who have noble ideas, but who have not enough experience to judge where a particular course must lead.

অর্থাৎ, দল বাড়ানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত "এই সব লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য অনুনয় এবং ভয় দেখানো—এই উভয়বিধ পন্থাই অবলম্বন করে থাকেন এবং আমি দুঃখিত চিত্তে বলছি যে আমি নিশ্চয় করে জানি যে রামকৃষ্ণ মিশনের মত একটি দাতব্য সংস্থার সদস্য হিসাবে বা ত্রাণকার্য পরিচালনার অংশীদার হিসাবে তাঁরা যে সব অবকাশ পান তার পূর্ণ সুযোগ তাঁরা বালকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন—এমন সব বালক যাদের আছে উচ্চ আদর্শ, কিন্তু যাদের এমন কোন অভিজ্ঞতা নেই যাতে করে তারা বিচার করে বুঝতে পারে যে কোন্ বিশেষ পন্থা তাদের সঠিক কোন দিকে টেনে নিয়ে যাবে।"

মিশনের বিরুদ্ধে এইভাবে প্রকাশ্যে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে অভিযোগ দায়ের করার পর কার্মাইকেল তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হন। তিনি বলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের মত ধর্মীয় এবং দাতব্য সংস্থাগুলি স্বাভাবিক কারণেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করে থাকে, তাই বাপ-মায়েরা সাধারণত নিজেদের সন্তানদের এই রকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে দিতে আপত্তি করেন না। কিন্তু তাঁরা ঘুণাক্ষরেও টের পাননা যে এগুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অবকাশে তাঁদের ছেলে-মেয়েরা সকলের অলক্ষ্যে কীরকম ভুল পথে পরিচালিত হয়। এমন কি ছেলেগুলি অনেক সময় নিজেরাও বুঝতে পারেনা যে তারা কী করতে চলেছে। কোন কোন সময় তাদের নিতান্ত সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং সেইমত কাজ করতে গিয়ে তারা ক্রমে যখন দলের অনেক গোপন কথা জেনে ফেলে তখন

অকস্মাৎ কোন একদিন তারা নিজেরাই উপলব্ধি করে যে কী সর্বনাশা কাজের জালে তারা জড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে তখন অনেকেই দল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু তখন তাদের নানা ভাবে ভয় দেখানো শুরু হয়ে যায় আর ভয়বিহ্বল সেই মানসিক অবস্থায় বালকগুলির আর পিছনে ফেরার কোন উপায় থাকেনা। এই ভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের দিয়ে নানা রকম অবাঞ্ছিত কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। সরল বিশ্বাস এবং ভক্তির আবেগে এই সব অবোধ বালক যাদের বিশ্বাস করেছিল তারাই শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে যায়। কার্মাইকেল এই সকল ভদ্রবেশী শত্রুদের সম্পর্কে দেশবাসীকে সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, "আপনারা যথার্থই দেশের প্রভূত উপকার সাধন করবেন যদি আপনারা সেই সকল লোকেদের বাধা দিতে পারেন যারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাংলা দেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অপরিসীম ক্ষতি সাধন করবার জন্যই ব্যবহার করে থাকে।" বক্তৃতার শেষে কার্মাইকেল প্রকারান্তরে এই ইংগিত দেন যে ভারতরক্ষা বিধি প্রভৃতি আইনগুলি আসলে দেশের এই সকল হীন ষড়যন্ত্রকারী মানুষদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্যই জারি করা হয়েছে। দেশের সরলমনা, অজ্ঞ সাধারণ মানুষকে চক্রান্তকারী গুটি কয় প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকার কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না এবং সেই কারণে প্রয়োজন মত কঠোরতা অবলম্বন করাও একান্ত আবশ্যক।

কার্মাইকেলের দীর্ঘ বক্তৃতায় মিশন সম্পর্কে সারা সময় নানা রকম তির্যক মন্তব্য করা হলেও, মিশনের নাম উল্লেখ করে মাত্র একটিবারই সরাসরি অভিযোগ পেশ করা হয়। আসলে মিশনের মত একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সরকার পূর্ণ মাত্রায় অবহিত ছিলেন। তাছাড়া আরও অসুবিধা ছিল। অতীতে মিশনের বিভিন্ন ত্রাণকার্য সম্পর্কে পদস্থ সরকারী অফিসারগণ নিজেরাই প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে গিয়েছেন। এমতাবস্থায় বাংলা দেশের উর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ এমন কিছু মন্তব্য করতে পারেন না যার ফলে মিশন সম্পর্কে সরকারের পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত ছিল বলে প্রমাণিত হয়। কার্মাইকেল তাই যথোচিত সাবধানতা নিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। মিশনের নামোল্লেখ করে একবার মাত্র অভিযোগ করার পরক্ষণেই তিনি অপেক্ষাকৃত মেলায়েম সুরে ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, মিশন সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর শ্রদ্ধার অন্ত নেই, মিশনের

নানা কল্যাণকর্ম দেশের যে কোন লোকেরই সমর্থন লাভের যোগ্য। তবে নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে তিনি এ কথাও সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, হীন এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের কিছু মানুষও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, যাদের ঠেকাতে না পারলে যারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হতে পারত সেই যুব সমাজের চিত্ত অচিরেই কলুষিত হয়ে উঠবে :

"I have the highest respect for the Ramakrishna Mission and for societies like it. I know of nothing more worthy of encouragement than the social service which these societies exist to promote, and there is nothing in India which I deplore more deeply, or of which it has been harder to convince me than the fact that mean and cruel men do join these societies in order to corrupt the minds of youngmen who would if only they were not interfered with, be benefactors to their fellow countrymen".

কার্মাইকেলের দরবার বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই মিশনের তরফে উপরে উল্লিখিত মূল অভিযোগগুলির জবাব দিয়ে একাধিক নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। এইগুলির প্রত্যুত্তরে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষও সরকার কর্তৃক আনীত অভিযোগ-গুলি যে একেবারে ভিত্তিহীন ছিলনা তা প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করে। এই ভাবে কার্মাইকেলের দরবার বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় মিশনের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সওয়াল-জবাব পেশ করা হয়েছিল সেগুলি নিম্নলিখিত চিঠি প্রবন্ধ ও গোপন নোটের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয় :[৩]

মিশনের পক্ষে

(ক) মিশনের ইংরাজী মুখপত্র *Prabuddhaharat or Awakened India*-র দ্বাবিংশ খণ্ড, ২৪৬ নং সংখ্যায়, ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত "On the Conning Tower" শীর্ষক প্রবন্ধ।

(খ) মিশনের সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক কার্মাইকেলের নিকট ১২ জানুয়ারি ১৯১৭ তারিখে লিখিত প্রতিবাদ পত্র।

(গ) গভর্নরের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি (Private Secretary) গোর্লে (Gourlay)-র নিকট লিখিত সারদানন্দের দ্বিতীয় পত্র—তাং ১২ই মার্চ ১৯১৬

মিশনের বিপক্ষে

(ক) লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি টিণ্ডেল (C. Tindall)-এর গোপন নোট—তাং ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭

(খ) অনারেবল মেম্বার লায়ন (P. C. Lyon)-এর কাছে বাংলা দেশের চিফ সেক্রেটারি ষ্টিফেনসন (H. L. Stephenson) কর্তৃক প্রেরিত গোপন নোট—তাং ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭

(গ) ষ্টিফেনসনের নোটের ভিত্তিতে রচিত এবং কার্মাইকেলের কাছে প্রেরিত লায়ন-এর গোপন নোট—তাং ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭

(ঘ) সারদানন্দের নিকট প্রেরিত কার্মাইকেলের শেষ পত্র—তাং ২৬শে মার্চ ১৯১৭

উপরে উল্লিখিত চিঠি ও প্রবন্ধ সমূহের মুল বিষয়গুলি এখানে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত On the Conning Tower শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক, কার্মাইকেলের অভিযোগগুলির জবাব দিতে গিয়ে মূলত দু ভাবে মিশনের পক্ষ সমর্থন করেন। প্রবন্ধের প্রথম অংশে লেখক রাজনৈতিক জাতীয়তবাদ (Political Nationalism) এবং আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ (Spiritual Nationalism)-এর মধ্যে একটি ভেদরেখা টানার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মিশন চিরকালই দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে এসেছে যে ভারতবর্ষের মত একটি বৈচিত্র্য ভরা দেশে একমাত্র ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতেই জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমের ভাবধারায় লালিত একদল উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসী এবং তাঁদের নেতারা মিশনের উপরোক্ত আদর্শে অবিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন ইউরোপের মত এ দেশেও সরকারের কাছ থেকে দাবী দাওয়া আদায় করার মাধ্যমেই জাতীয় সংহতি অর্জন করতে হবে। এই শেষোক্ত দল অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যকে যাঁরা একান্ত ভাবেই রাজনীতি-নির্ভর বলে মনে করেন, তাঁরাই দেশের নেতা এবং সরকারও দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি

হিসাবে জ্ঞান করে একমাত্র তাঁদের সঙ্গেই যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেন। এই সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের আশায় রাজনীতি সিদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী। অর্থাৎ সরকার-বিরোধী সংগ্রাম যদি সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় তবে তা এই সব রাজনীতিকদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে এবং এই আন্দোলন যখন সাংবিধানিক রীতির সীমা লঙ্ঘন করে নৈরাজ্যের বিশৃঙ্খল (Political anarchism) আকার ধারণ করে, কেবল মাত্র তখনই নেতারা তার বিরোধিতা করতে উদ্যত হন। কিন্তু রাজনৈতিক উচ্চাশা যদি একবার উস্কে দেওয়া হয় তখন তা চরিতার্থ করবার জন্য যে আন্দোলন এবং সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে যায় তার কতটুকু সাংবিধানিক আর কতটুকু সাংবিধানিক সীমার অতিরিক্ত তা যাচাই করা একান্তই কঠিন। তাছাড়া এই সব আন্দোলনে যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের পক্ষেও সাময়িক উত্তেজনা এবং আবেগ পরিহার করে সকল সময়ে বিধিসম্মত সীমার মধ্যে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা।

আজ যখন সরকার সন্ত্রাসবাদ এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অপরাধ সমূহের হিসেব দেখে বিব্রত হয়ে উঠছেন তখন একটি কথাই তাঁদের প্রসঙ্গত স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা হল এই, দেশের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি যখন ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করছিল তখন সরকারের তরফে তার কারণ বা প্রতিকারগুলি স্থির করার উদ্দেশ্যে দেশের সাধারণ মানুষের অভিমত যাচাই করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সরকারের জানা উচিত ছিল যে, কেবল মাত্র রাজনৈতিক নেতারাই আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের একমাত্র প্রতিনিধি নন। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সমাজের যে কতদূর ক্ষতিসাধন করতে পারে সে সম্পর্কে এই সকল নেতাদের কোন ধারণাই নেই। একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনই এই বিষয়ে সব চেয়ে সুস্থ চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়ে এসেছে। মিশন বরাবরই বলে এসেছে যে, দেশের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির অবসানকল্পে সরকার এবং রাজনৈতিক নেতা—এই দুটি গোষ্ঠীকেই সমানভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যে অপার বৈষম্য দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে চলেছে তা দূর করবার জন্য সর্বপ্রথম সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে, আর সেই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক নেতাদেরও অধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে স্বদেশের জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলবার জন্য যুগপৎ চেষ্টা করতে

হবে! 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা এবং মিশনের বিভিন্ন মুখপত্রে এ কথা বারবার বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের সকল দুঃখ ও লাঞ্ছনার মূল কারণ হল সংগঠন শক্তির অভাব। একমাত্র আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক জাতীয়তার পথেই এই সাংগঠনিক শক্তি বিকশিত হতে পারে এবং বিপরীত ভাবে রাজনীতি ভিত্তিক জাতীয়তা এই রকম শক্তি সঞ্চয়ের পথে বিঘ্ন ঘটায়। মিশনের এই সুস্পষ্ট মতাদর্শ, (যার প্রথম প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ) ইতিপূর্বে বহু স্থানেই প্রকাশ্যে মুদ্রিত ও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সরকার বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ—কোন পক্ষই এই সকল যুক্তি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন নি। আর সব চেয়ে আফসোসের কথা হল এই, যে ব্যাধির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করে সরকার পশ্চিমী রীতি অনুযায়ী শুধু অত্যাচার, নিপীড়ন এবং অন্যান্য নেতিবাচক পদ্ধতির সাহায্যেই এ দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে স্বাভাবিক রাখতে চাইছেন। ফলে সামগ্রিক ভাবে দেশের অবস্থা অনেকটা দুই বজ্রমুষ্টি অন্ধ যোদ্ধার লড়াইতে পর্যবসিত হতে চলেছে :

"And the deepest cause for anxiety is that government taking a superficial view of the political disease, unenlightened as to the real radical methods of combating it and relying solely on experience in western history, has committed itself to a superficial and negative course of stringent political repression. It is like the blind coming to slashing blows nailed grips with the blind."

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার উল্লিখিত প্রবন্ধের প্রথম অংশটিতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কেবল মাত্র সাধারণ ভাবে একটি আলোচনা করা হয়। মিশন সম্পর্কে কার্মাইকেলের অভিযোগের যথাযথ উত্তর প্রবন্ধের প্রথমাংশে দেওয়া হয়নি। প্রবন্ধের দ্বিতীয় বা শেষ অংশটিতেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রবন্ধ লেখক দু ভাবে যুক্তি বিস্তার করেন। তিনি বলেন যে সরকারী মহল তাদের নিজস্ব সংবাদ সূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু এই সকল তথ্য সম্পর্কে মিশনকে কখনই বিস্তারিত ভাবে কিছু জানানো হয়নি! এগুলি জানা থাকলে মিশন কর্তৃপক্ষ এ সব বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে অনুসন্ধান করতে পারতেন এবং সে ক্ষেত্রে সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলির

সত্যাসত্য সহজেই যাচাই করে নেওয়া যেত। কিন্তু সরকার, মিশনকে এই সুযোগ দেননি, অথচ তৎসত্ত্বেও এক তরফা সংবাদের উপর ভিত্তি করে তাঁরা, দেশের সর্বনাশ সাধনে তৎপর এক দল হীন ও নিষ্ঠুর লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিশনে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন। এমতাবস্থায় মিশনের গঠনতন্ত্র এবং সাংবিধানিক রীতিনীতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন যাতে করে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে মিশন সকল অবস্থাতেই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতী।

রামকৃষ্ণ মিশন একটি সুশৃঙ্খল ধর্মীয় ও সেবাপ্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের দুটি অঙ্গ। একটি হল মিশনের সন্ন্যাসী সমাজ যার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সন্ন্যাসীর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি দিক মিশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যার ফলে মিশন তাঁদের সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। সুসংযত. নিয়ন্ত্রিত এবং কেন্দ্রীভূত সন্ন্যাসী সমাজ মিশনের সংঘবদ্ধ জীবনের নীতি এবং কর্মসূচী নির্ধারণ করে থাকে। সংঘবদ্ধ জীবনের এই কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ব্যক্তিগত ভাবে কোন সন্ন্যাসীর পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং তা যদি কেউ করেন তাহলে তিনি সহজেই চোখে পড়ে যাবেন ও সেক্ষেত্রে মিশন থেকে তাঁর বিতাড়ন অবশ্যম্ভাবী। মিশনের সন্ন্যাসীদের তাই মিশনের অজ্ঞাতসারে কোন কিছু করা সম্ভব নয় এবং বাইরে থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কারও মিশনের মধ্যে ঢুকে পড়ারও সম্ভাবনা নেই। আর সে রকম অঘটন কিছু ঘটে গেলেও সেই বহিরাগত ব্যক্তিটির পক্ষে মিশনের কোন সন্ন্যাসীকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হবেনা। এমতাবস্থায় সরকার যে অভিযোগ করেছেন যে, বাইরে থেকে কিছু লোক এসে মিশনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন, সে কথা মিশনের এই সন্ন্যাসী সমাজ বা monastic order সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না।

কিন্তু এঁরা ছাড়াও রামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মিশনের প্রতি অনুরক্ত এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা মিশনের নানা কল্যাণকর্মে সো সাহ অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এঁরা মিশনের বাইরে থেকে মিশনের সেবাব্রতকে সফল করার জন্য চেষ্টা করেন এবং মিশন কর্তৃপক্ষও এঁদের সহযোগিতা ভিন্ন তাঁদের কর্মসূচীকে একক ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারবেন না। মিশন-অনুরাগী এই সকল বহিরাগত কর্মীদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ সরকারের অভিযোগ মত প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কর্মী থেকে যেতে পারেন। এ সম্ভাবনা

একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু মিশন এদের কি ভাবে সনাক্ত করবে? কাজের ব্যাপারে এদের সাহায্য গ্রহণ করলেও মিশন এদের হাতে কোন অবস্থাতেই নেতৃত্বের দায়িত্ব বা পরিকল্পনা রচনার ভার অর্পণ করেনা, এরা শুধু মিশনের পরিচালনায় কাজ করবার দায়িত্বটুকুই পেয়ে থাকে। মিশনের তরফে এতদূর সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি কোন বহিরাগত কর্মী প্রচ্ছন্ন ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে মিশন সে ব্যাপারে পুরোপুরি অবহিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বাধা দেবে কিভাবে? বস্তুত রামকৃষ্ণ মিশনের মত এত বড একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই রকমের একটা বিপদের সম্ভাবনা সব সময়েই থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে এই রকমের একটি অনিবার্য সম্ভাবনার দায়ে মিশনকে সরাসরি অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করাটাও সঙ্গত নয়। বাস্তবিক সরকার যদি মিশনের কোন স্বীকৃত সদস্যের বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ দায়ের করতেন তাহলে মিশনও ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে যাহোক একটা প্রতিকার নিশ্চয় খুঁজে বের করত। কিন্তু মিশনের বহিরাগত কর্মীদের সম্পর্কে কেবল অস্পষ্ট কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে মিশন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনা।

প্রবন্ধ লেখক এই ভাবে সরকার কর্তৃক আনীত অভিযোগ সমূহের যুক্তি খণ্ডন করার পর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে প্রকারান্তরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মিশন পরিচালিত সংগঠনগুলির মধ্য থেকে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের খুঁজে বের করার কাজে মিশনও পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই খোঁজাখুঁজির অবসরে সরকারকেও একটি বিষয় ভেবে দেখতে হবে। তা হল এই যে, রাজনৈতিক কর্মীদের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে শুধু উৎসাদন করলেই সকল কাজ সিদ্ধ হবেনা। রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে যে সকল যথার্থ উৎসাহী ও দৃঢ়চেতা মানুষ রয়েছে এবং যাঁদের মধ্যে সেবাব্রতীর জীবনে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা এখনও রয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সমাজের আদর্শ এবং জীবনধারায় তাঁদের জীবনের সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। মনুষ্যচিত্তের সকল হীন প্রবৃত্তিগুলিকে সংহার করার জন্যে সেগুলিকে অবদমন না করে তাদের অতিক্রম করে যেতে হবে, যাতে এই সবের উর্ধ্বে উঠে যে-কোন মানুষ রামকৃষ্ণ মিশন নির্দেশিত সেবাধর্ম এবং স্বাদেশিকতার পরিমণ্ডলে আশ্রয় লাভের উপযুক্ত হয়:

"But we should remember at the same time that if there is any scope any where in the country for real, radical reclamation of political suspects and enthusiasts who have still the promise in them of a truer life of service, then that scope can be looked for only in that discipline of thought and life which the monastic order of this Ramakrishna Mission undertakes to impose through its spiritual ideals of service and patriotism, for it is only a higher enthusiasm that can truly supersede in the human mind a lower one, for we can only kill it by transcending but never by repressing."

অতএব প্রবন্ধ লেখক প্রকারান্তরে সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। অর্থাৎ মিশন যদি কোন রাজনৈতিক কর্মীকে আশ্রয় দিয়েও থাকে তাহলেও সেটা সমর্থনযোগ্য, কেননা এই আশ্রয়দানের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক কর্মে ইন্ধন যোগানো নয়, রাজনীতির সৎ কর্মীদের সুস্থ ও মহত্তর জীবনে পুনর্বাসিত করা। বস্তুত এই পুনর্বাসনের যুক্তি দেখিয়েই মিশন এক কালের বহু বিপ্লবী কর্মীকে প্রকাশ্যেই মিশনে আশ্রয় দিয়েছিল। প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিমতটি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে গিয়েছেন। রাজনীতির পতন-অভ্যুদয় পথের সঙ্ঘর্ষে অনেকেই শেষ জীবনে ক্লান্ত ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হেমচন্দ্রের মতে, এই হতাশার মুহূর্তে রাজনীতির পথ থেকে সম্মানজনক ভাবে অব্যাহতি পাবার জন্য অনেকেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জীবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এক কালের বহু প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় রাজনীতিক এই ভাবে সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করেছিলেন।[৪]

কার্মাইকেলের অভিযোগের জবাবে দ্বিতীয় প্রতিবাদটি একটি স্মারক পত্রের আকারে রচিত হয়েছিল। মিশনের একাধিক সদস্যের তরফে সেক্রেটারি সারদানন্দ স্বামী এটি ১৯১৭ সালের ২২শে জানুয়ারি তারিখে স্বাক্ষর করে বেলুড় মঠ থেকে সরাসরি গভর্নরের কাছে পাঠিয়ে দেন। বারোটি নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদে সাজানো এই দীর্ঘ পত্রটি সেকালের শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী একটু জটিল ভাবেই রচিত হয়েছিল। এর ভাষা এবং বাক্য বিন্যাস ছিল অনাবশ্যক রকমের দুরূহ, কিন্তু যুক্তিগুলি ছিল অত্যন্ত প্রখর।

স্মারক পত্রের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদে গভর্নর তাঁর দরবার বক্তৃতায় সেবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মিশনের নাম উল্লেখ করেছিলেন বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হলেও, তাঁর বক্তৃতার প্রতিবাদ জানাতে কেন এই স্মারক পত্র রচনা করতে হল তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পত্রের একাদশ এবং দ্বাদশ অনুচ্ছেদেও এই কারণগুলি ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে রাজনীতির কাজে মিশনের জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়, তার ফলে মিশনকে অর্থ সাহায্য করেন এমন অনেক লোক নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু এই সব লোকের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন মিশনের বহুমুখী সেবা কর্ম বজায় রাখা নিতান্তই অসম্ভব সুতরাং নিছক অস্তিত্বের স্বার্থেই মিশনকে গভর্নর কর্তৃক আনীত অভিযোগ সমূহের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।

অভিযোগগুলি খণ্ডন করতে গিয়ে পত্রের চতুর্থ অনুচ্ছেদে এ কথা স্বীকার করা হয় যে, মিশনে আশ্রয় প্রাপ্ত কোন কোন ব্যক্তির চরিত্র হয়ত এককালে রাজনৈতিক কারণে দূষণীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু মিশন সব জেনে শুনেও তাদের আশ্রয় দিয়েছে যাতে তারা পুরনো পথ থেকে ফিরে এসে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার জীবনে পুনর্বাসিত হয় ("The acceptances of novices would be for the purpose of weaning such men from their former courses".)। বস্তুত খৃষ্টধর্ম সহ অন্যান্য যে কোন ধর্মেই এই রকম ভাবে বিপথগামীকে ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়ে থাকে। তাই রামকৃষ্ণ মিশনও যদি এই ভাবে কাউকে সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়ার জন্য নিজেদের সংঘজীবনে আশ্রয় দিয়ে থাকে তবে সেই কারণে তাকে অভিযুক্ত করা সাজে না।

স্মারক পত্রের অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলিতে মিশন-কর্তৃপক্ষ তিন প্রকারের যুক্তির সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। প্রথমে বলা হয় যে, মিশনের অন্তর্ভুক্ত মোট ২০১ জন সদস্যের (৭৮ জন সন্ন্যাসী, ১২১ জন গৃহী সদস্য ও ২ জন সহযোগী সদস্য) অতীত এবং বর্তমান খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে যে কেউ কেউ কোন সময় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাছাড়া মিশনের নিয়ম অনুযায়ী কোন রাজনীতি করা লোককে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। বস্তুত মিশনের সদস্যভুক্তির জন্য এত সব বিভিন্ন প্রকারের বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে যে, এর সদস্য সংখ্যা অন্য যে কোন ধরনের সমগোত্রীয়

প্রতিষ্ঠানের তুলনায় উল্লেখযোগ্য রকমের কম। মিশন ইচ্ছা করেই সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার পক্ষপাতী, কেননা তা নাহলে এই প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও গুরুত্ব অচিরেই হ্রাস পাবে। অতএব এই রকম কঠোর বাধা-নিষেধের প্রহরা এড়িয়ে কোন রাজনীতি করা লোক কুমতলব নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে ঠাঁই করে নিতে পারবেন না। কাজেই কতিপয় নিষ্ঠুর এবং হীন চরিত্রের লোক মিশনের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন বলে গভর্নর যে অভিযোগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তা একান্তই অমূলক।

দ্বিতীয়ত, রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি কোন রাজনৈতিক কর্মীকে যুক্ত থাকতেও দেখা যায়, তবে তার দায়িত্ব নির্বিচারে রামকৃষ্ণ মিশনের উপরে চাপিয়ে দেওয়াটাও ঠিক নয়। আসলে রামকৃষ্ণের মত এক জন মহান সাধকের নাম নিয়ে যে কোন ব্যক্তিই একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করতে পারেন ; কিন্তু সেই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিশনের কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ বউবাজারের রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার-এর কথা বলা যেতে পারে। স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স (Sir Lawrence Jenkins), পাইন (C. F. Pyne) এবং লায়ন-এর মত পদস্থ সরকারী কর্মিগণ এই প্রতিষ্ঠানের নানা অনুষ্ঠানে বহুবার যোগদান করেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এ-হেন একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন যোগসম্পর্ক নেই। অতএব মিশনের ভিতরে রাজনৈতিক কর্মীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে অভিযোগ করার আগে অভিযোগকারীকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে যে তথাকথিত ঐ সকল রাজনৈতিক কর্মী রামকৃষ্ণ নামের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কিনা ; কেননা এই সব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই মিশনকে অন্যান্য সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। বস্তুত মিশনের পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি অনায়াসেই দেওয়া যেতে পারে যে মিশন সকল সময়েই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতী। এমন কি মিশন পরিচালিত নানা ধরনের সেবা কাজে যারা অর্থ এবং শ্রম দিয়ে সাহায্য করে তারাও যাতে রাজনীতির লোক না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এবং সম্প্রতি এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে মিশনের কাজে যোগদানে ইচ্ছুক এই সকল লোকের কাছ থেকে তাদের অরাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে নেওয়া হবে।[৫] এত সব সাবধানতা অবলম্বনের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য—তা হল মিশনের অরাজনৈতিক চরিত্রটি অক্ষুণ্ন রাখা।

আত্মপক্ষ সমর্থনে মিশনের সব চেয়ে জোরাল যুক্তিগুলি স্মারক পত্রের নয় এবং দশ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছিল। মিশনের পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা যে কত অসম্ভব তার কারণ এবং সাক্ষ্য-প্রমাণাদি এইখানে সবিস্তার বর্ণনা করা হয়। প্রথমেই বলা হয় যে মিশনের পরিচালক মণ্ডলীর সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচানোর জন্য মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ স্বামী, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট. টেগার্ট-এর পরামর্শ অনুযায়ী ইতিপূর্বে কাগজে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণকে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ভাঁড়িয়ে যারা রাজনীতি করে সেই সকল বিপজ্জনক ব্যক্তিদের সম্পর্কে সাবধান করে দেন। *A Warning to the Public* শীর্ষক এই প্রবন্ধটি ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা দেশের নাম-করা সকল দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয়ত, মিশন যে যথার্থই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে আগ্রহী সে বিষয়ে তার আন্তরিকতা প্রমাণ করার জন্য মিশন কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে বহুবার পুলিশ অফিসারদের নানা অনুসন্ধান কাজে সহযোগিতা করে এসেছে। ডেনহাম (ইনি ছিলেন পুলিশের ডি-আই-জি) এবং টেগার্ট-এর মত জাঁদরেল পুলিশ অফিসারগণ তাঁদের অনুসন্ধান কাজে ইতিপূর্বে অনেকবারই বেলুড় মঠে সশরীর হাজির হয়েছিলেন এবং সেই সময় মঠের পরিচালকবৃন্দ তাঁদের যেভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তার জন্য তাঁরা নানাভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া খোদ গভর্নরের পত্নী লেডি মিণ্টো-ও একবার বেলুড় মঠে পদার্পণ করেছিলেন। মঠে এই সকল অভিজাত রাজপুরুষদের উপস্থিতি মিশনের অরাজনৈতিক চরিত্রের পরিচয় দেয়। বস্তুত একটি মামলার রায়দান প্রসঙ্গে হাওড়ার তৎকালীন জেলা শাসক ডিউক (Sir William Duke) ১৮৯৯ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে মিশনকে একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবেই সাব্যস্ত করেছিলেন।

মিশনের নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য স্মারক-পত্রে মিশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বেনারসের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কথা উল্লেখ করা হয়। উপরোক্ত সেবাশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত ১৯১৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টটির অংশ বিশেষও এই প্রসঙ্গে প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করা হয়। এগুলি পাঠ করে জানা যায় যে, সেবাশ্রমের নানা কল্যাণ কর্মে স্থানীয় সরকার, সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষকে নানা ভাবে সহায়তা করেছিলেন। এমন-কি সেবাশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করার

জন্য উত্তর প্রদেশ সরকার সে সময় নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসান এ্যাক্ট অনুযায়ী নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এই সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে স্মারক-পত্রে প্রকারান্তরে এই কথাটিই বলা হয়েছিল যে সরকারের তরফে মিশনের প্রতি এই মূল্যবান সহযোগিতা বিনা কারণে অর্জিত হয়নি। মিশন যদি সরকার বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে সত্যিই জড়িত থাকত, তাহলে সরকার কখনই তাকে এই ভাবে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসতেন না। এই সাহায্য এবং সহযোগিতা মিশনকে অর্জন করতে হয়েছে রাজভক্তি এবং সরকারের নীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিনিময়ে।[৬]

প্রতিপক্ষের সকল অভিযোগ এই ভাবে খণ্ডন করার পর স্মারক-পত্রের শেষ দুটি অনুচ্ছেদে গভর্নর সকাশে একটি বিনীত আবেদন পেশ করা হয়। পত্র লেখক বলেন যে মিশন সম্পর্কে গভর্নরের তির্যক মন্তব্য মিশনের পৃষ্ঠপোষকগণকে নিরুৎসাহী করে দিয়েছে এবং তার ফলে মিশনের অর্থভাণ্ডারে প্রত্যাশিত চাঁদা আর আদায় করা যাচ্ছেনা। এই অবস্থায়, কনখল, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মিশন-পরিচালিত সেবা কাজগুলির ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে এবং এই অসুবিধার জন্য হয়ত সেগুলি একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। এই সঙ্কট এড়ানোর উপায় হিসাবে গভর্নর যদি মিশন সম্পর্কে তাঁর অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করে নেন এবং দরবার বক্তৃতার সংশ্লিষ্ট অংশগুলি এমন ভাবে সংশোধন করেন যে মিশন সম্পর্কে জনসাধারণের পূর্বেকার আস্থা পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহলেই এক মাত্র সকল দিক রক্ষা হতে পারে :

"With this humble memorial and explanations which your Excellency's memorialists are prepared to support in detail, they trust and pray that your Excellency before leaving India, will do the Mission the very great and helpful service—one fully in keeping not only with the spirit of your Excellency's address, but with the fairness and openness which have animated the whole of your Excellency's rule…of in some way correcting the disastrous impression of the Mission which has unfortunately arisen since the Durbar speech."

পূর্বোক্ত স্মারক পত্রটি পাঠানোর প্রায় দেড় মাস পরে ১৯১৭ সালের ১২ই মার্চ তারিখে সারদানন্দ মিশনের তরফে সর্ব শেষ চিঠিটি পাঠিয়ে দেন। এটি বাগবাজারের ১নং মুখার্জী লেন থেকে ছাড়া হয়েছিল এবং এটি গভর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারি গোর্লে-র নিকট প্রেরিত হয়েছিল। এর আগে গভর্নরের দপ্তর থেকে মিশনের কাছে পত্র মারফত জানতে চাওয়া হয় যে, গভর্নরের দরবার বক্তৃতার সংশোধন করে, কী ধরনের বিবৃতি তাঁরা সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন সে সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ভাবে তাঁদের মতামত যেন অবিলম্বে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই চিঠির জবাবে সারদানন্দ চারটি নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদে মিশনের বক্তব্য জ্ঞাপন করে গোর্লের কাছে পত্র লেখেন। চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদে সবিনয় নিবেদন করা হয় যে, গভর্নর যে ভাবেই হোক-না-কেন এমন একটা কিছু বলুন যার ফলে লোকের ধারণা হয় যে মিশন যথার্থই একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সংস্রব নেই। তবে সারদানন্দ এই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে এই রকমের একটি বিবৃতি দিতে গেলে গভর্নরের যদি আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে তাঁকে যেন এই বিষয়ে আর বিব্রত না করা হয়।

চিঠিটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, আসলে রামকৃষ্ণ মিশনের উপরে এখনও সরকারের সহানুভূতি এবং আস্থা রয়েছে এই তথ্যটুকু জানিয়ে গভর্নর যে বিবৃতিই দিন, তা-ই মিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে গভর্নর যদি পছন্দ করেন তাহলে ব্যাপারটা এই ভাবে বলা যেতে পারে যে, তাঁর দরবাবর বক্তৃতায় মিশনের সেবা কাজের প্রতি সরকারের যে সহানুভূতি রয়েছে সেই মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যই গভর্নর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন। আসলে গভর্নর নিজেও জানেন যে সৎ অসৎ নির্বিশেষে মিশনকে সকল শ্রেণীর মানুষ নিয়েই কাজ করতে হয় এবং বলতে বাধা নেই যে শেষোক্ত গোত্রের মানুষদের জন্যই মিশন বেশি করে চিন্তিত। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে মিশন এই সকল বিপথগামী লোকদের ন্যায় ও ধর্মের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে আগ্রহী। এই ধরনের লোকদের জন্য কাজ করতে গিয়ে মিশনের মূল কর্মসূচীটিই ব্যাহত হতে পারে। বস্তুত এই ব্যাপারেই মিশনকে প্রকারান্তরে একটু সতর্ক করে দেওয়ার জন্য গভর্নর দরবার বক্তৃতার সময় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। কিন্তু লোকে যদি তাঁর সেই বক্তৃতার অর্থ ভুল বুঝে মিশনের প্রতি তাদের সকল সহযোগিতা এবং আনুকূল্য প্রদর্শন বন্ধ রাখে,

তাহলে গভর্নর ব্যক্তিগত ভাবে সেই পরিস্থিতিতে যৎপরোনাস্তি দুঃখ বোধ করবেন।

এইভাবে প্রত্যাশিত বিবৃতির বয়ানটি রচনা করে দিয়ে সারদানন্দ তাঁর চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে জানান যে, গভর্নর ইচ্ছা করলে বয়ান অনুযায়ী বিবৃতি না দিয়ে অন্য যে-কোন ভাবেও তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন এবং সে ক্ষেত্রে মিশনও গভর্নরের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন বিবৃতি পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু মিশনের পক্ষে সব চেয়ে ভাল হয় যদি গভর্নর উপরোক্ত বয়ান অনুযায়ী বিবৃতি দিতে সক্ষম হন, কেননা, "প্রিয় গোর্লে, মিশনের সামনে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে তার থেকে রেহাই পাওয়ার অন্য কোন পথ আমাদের জানা নেই।"

কিন্তু প্রার্থনা অনুযায়ী গভর্নরের বিবৃতি কি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়েছিল? প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে মিশন সম্পর্কে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ভ্রান্ত ধারণার অবসানকল্পে মিশনের তরফে এই সময় একবার খোদ গভর্নরকেই বেলুড় মঠ ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও সরকার মিশনের ২২ শে জানুয়ারির স্মারক পত্রটির প্রস্তাব মত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হননি। সকলেই জানেন সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গভর্নর ব্যক্তিগত দায়িত্বে কোন কিছু লেখেন না, তাঁর হয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট অফিসাররাই সব কিছুর বয়ান রচনা করে দেন। তাই প্রস্তাবিত বিবৃতিটি দেওয়া উচিত কিনা সে সম্পর্কে বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি সহ অন্যান্য পদস্থ অফিসারদের কাছ থেকে যথাসময়ে অভিমত সংগ্রহ করা হল। এই সকল অভিমত সমূহ প্রায় পুরোপুরিই মিশনের বিপক্ষে গিয়েছিল। যে সকল সরকারি অফিসার এইভাবে মিশনের বিপক্ষে তাঁদের মতামত পেশ করেছিলেন সেগুলি খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। পূর্বে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বিভিন্ন রাজপুরুষগণের গোপন নোটগুলির একটি তালিকা দেখানো হয়েছে। বর্তমানে সেগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে।

রামকৃষ্ণ মিশনের মিশনের বিরুদ্ধে কার্মাইকেলের অভিযোগগুলির সারবত্তা প্রমাণ করবার জন্য সর্বপ্রথম যে অফিসার রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তাঁর নাম টিগেল। জেলা এবং দায়রা বিচারক হিসাবে ইনি বাংলা দেশে বহুদিন চাকুরী করেছিলেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে ইনি বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের গোপন ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে নানা রকমের রিপোর্ট প্রস্তুত

করেছিলেন। *Perversion of the Ramakrishna Mission* নামে এই রকমের আরও একটি রিপোর্ট ইনি রচনা করেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে ধৃত বিভিন্ন ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি ও অন্যান্য অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে, ইনি রামকৃষ্ণ মিশন কি ভাবে সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক কাজে ভিড়িয়ে দিয়ে থাকে সেই ব্যাপারে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন রচনা করেন। এই প্রতিবেদনটি ১৯১৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে জমা দেওয়া হয়। টিগেল সেই সময় লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেণ্টের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি ছিলেন। টিগেলের এই দীর্ঘ রিপোর্টটিতে নিতান্ত এলোমেলো ভাবে নানা রকমের সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। পরিবেশিত সংবাদগুলির পূর্বাপর প্রসঙ্গ নির্দেশ করার কোন চেষ্টা হয়নি। সচরাচর পুলিশ নোট যেমন হয়ে থাকে সেই রকম এই রিপোর্টেও একটানা অসংখ্য ফাইলের উল্লেখ করে কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে। এই ফাইলগুলি সরকারের কোন বিভাগে সংরক্ষিত আছে টিগেল তার কোন হদিস দেননি, ফলে টিগেলের দেওয়া তথ্যগুলি বিধিসম্মত ভাবে যাচাই করাও সম্ভব হয়নি। তথ্যগুলি মূলত স্বীকরোক্তির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু আদালতের নিয়ম অনুযায়ী এই স্বীকারোক্তি-গুলি (confessions) গ্রাহ্য প্রমাণ বা admissible evidence হিসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে টিগেল কোন মন্তব্য করেননি। ফলে সন্দেহ থেকেই যায়। যাহোক এই রিপোর্টে রাজনীতির দায়ে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি ও অন্যান্য নানা ঘটনা সম্পর্কে যে সকল কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বিবৃত হল। উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনার বাম পাশে টিগেলের দেওয়া সংশ্লিষ্ট ফাইল নম্বরটিও উল্লেখ করা হয়েছে :

৪৩৮ সি ও ৬১২ সি : এই দুটি ফাইলে যোগেশ চন্দ্র রায় এবং বৈরাগী ত্রিপাঠি নামে দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম জন স্বীকার করে যে রামকৃষ্ণ সংক্রান্ত পত্র পুস্তিকা পাঠ করে সে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিতে ইচ্ছুক হয়। দ্বিতীয় জন রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সদস্য। সে বিডন স্কোয়ারে এক প্রকাশ্য সভায় প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে বাংলা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়।

৪৬৫ সি : এই ফাইলে উল্লিখিত ব্রজেন্দ্রনাথ দে রামকৃষ্ণ মিশনের তহবিলে চাঁদা সংগ্রহের কাজে লিপ্ত ছিল। পুলিশের উদ্ধার করা একটি বিপ্লবী সংকেত লিপিতে (Revolutionary Cipher) এই লোকটির নাম খুঁজে পাওয়া

যায়। এর কাছে প্রচারের উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ সংক্রান্ত পত্র-পুস্তিকা নিয়মিত ভাবে পাঠানো হত।

২৯০ সি : এইখানে সনৎ চক্রবর্তী, জ্ঞান মহারাজ, মাখন সেন প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়েছে। এঁরা সকলেই মিশনে সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এঁদের কথা অন্যান্য ফাইলেও বর্ণনা করা হয়েছে। সনৎ তার স্বীকারোক্তিতে অতুল সেন, সতীশ সিং প্রভৃতির নাম উল্লেখ করে এবং এদের দুজনকেই মিশনের সরগাছি আশ্রমের কাজে নানা ভাবে যুক্ত থাকতে দেখা গিয়েছিল। সনৎ কর্তৃক উল্লিখিত জ্ঞান মহারাজ বর্ধমানে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজে মাখন সেনের সাহায্য নিয়েছিলেন। মাখন বেলুড় মঠের বিভিন্ন উৎসবে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। এঁর বিশেষ পরিচিত বিনোদ দাশগুপ্ত নামে জনৈক ব্যক্তি রামকৃষ্ণের সহধর্মিনীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পুলিশ এদের প্রত্যেককেই সন্দেহের চোখে দেখত।

৪৯১ সি : এই ফাইলে উল্লিখিত মতিলাল বিশ্বাস নামক ব্যক্তিটি রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়। এই ব্যক্তিটির সঙ্গে মিশনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং একে একাধিকবার বেলুড়ে বসবাস করতে দেখা গিয়েছে।

৪১৪ সি : কুঞ্জলাল সাহা নামক যে ব্যক্তিটির কথা এই ফাইলে বলা হয়েছে সে আলিপুর বোমা মামলার আসামী হিসোবে অভিযুক্ত হয়েছিল এবং গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ও পরে উভয় সময়েই সে মিশনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করত। কুঞ্জলাল, জার্মান ষড়যন্ত্রের সক্রিয় কর্মী এবং বালেশ্বরে নিহত বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিল।

৬১৩ সি : এই ফাইলে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত পরেশ মোহন দাস নামক এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। সে তার জবানবন্দীতে বলে যে "বিপ্লবী দলের কয়েক জন সদস্য রামকৃষ্ণ মিশনেরও সদস্য ছিলেন। বস্তুত পক্ষে আমাদের দলের কয়েকজন লোক বিপ্লবী দলে সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়েই রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবেশ করেছিলেন।" এই ফাইলের সঙ্গে ২৫৩ সি, ২৩৫ সি, ৩৬৩ সি এবং ৫৬০/১৯১৫ ও ৪৩০ সি প্রভৃতি ফাইলগুলি মিলিয়ে পড়লে নলিনী কিশোর গুহ, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বসু, অমৃত চক্রবর্তী, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, অমৃত হাজরা, সুধীন্দ্র কুমার বসু, দীনেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, ইন্দ্রভূষণ দেব, অনন্ত কুমার হালদার, গঙ্গাধর চ্যাটার্জী, দেবেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ বিপ্লব কর্মীর নাম জানা যায়। এঁরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ভাবে মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এঁদের মধ্যে অনেকেই বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সোৎসাহ অংশ গ্রহণ করতেন। নগেন্দ্র চন্দ্র গুহরায় এবং মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা নামক এই রকম দুই ব্যক্তি বেনারসের মিশন সেবাশ্রমে অর্থ সাহায্য করেন এবং এঁদের কথা উক্ত সেবাশ্রমের রিপোর্টেও উল্লিখিত হয়েছে। এঁদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ডাকাতি, নরহত্যা, বিপ্লবীদের আশ্রয় দান, বিপ্লবী প্রচার পত্র বিলি করা, বে-আইনি অস্ত্র মজুত রাখা প্রভৃতি নানা রকমের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভারত জার্মান ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত ছিলেন। এঁরা সকলেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ রচনাবলীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনা ও পত্র-পুস্তকাদি বিপ্লবীদের ক্রিয়া-কাণ্ডে কি পরিমাণে উৎসাহ যোগাত সে বিষয়ে টিগুেল বিভিন্ন ঘটনা নথিবদ্ধ করে যান। এইগুলি ২৬৪ সি, ৫৬৬ সি, ৬৮ সি, ৪৪৬ সি প্রভৃতি বিভিন্ন ফাইলের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই সকল ফাইলে জীবনলাল চ্যাটার্জী, গোবিন্দ মোহন মুখার্জী, প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, অনিল চন্দ্র দত্ত, সিতাংশু ভূষণ চ্যাটার্জী, গিরীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ বহু সংখ্যক বিপ্লব কর্মীর নাম করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি এবং অন্যান্য নানা রকম অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে যে উল্লিখিত ব্যক্তিরা নিয়ম করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ রচনাবলী যত্ন সহকারে পাঠ করতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই এমনও স্বীকার করেন যে, রামকৃষ্ণ সংক্রান্ত সাহিত্য পাঠ করার ফলেই তাঁদের বুদ্ধি বিকৃতি ঘটে এবং তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। নিবারণ চন্দ্র ঘটক নামক জনৈক স্বীকারোক্তি প্রদানকারী রাজবন্দী এই রকম একটি ঘটনার বর্ণনা দেয়। সে বলে যে অবনী নামে একটি লোক "আমাকে প্রায়ই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বই ও ধর্মীয় পুস্তকাদি দিয়ে যেত। সে বইগুলি খুব কম সময়েই ফেরত নিত এবং সেজন্য ওগুলি আমার কাছেই থেকে যেত। সে একদিন আমাকে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশনে নিয়ে যায়" এবং পরে কোন এক সময় এই লোকটিই তার কাছে বেআইনি পিস্তল ও গুলি গচ্ছিত রেখে যায়। ৩৫৫ সি ফাইলে নারায়ণ দাস নামে অপর একজন অপরাধ স্বীকার কারী ব্যক্তির উল্লেখ আছে। সে বলে যে, সে একদিন বেলুড় মঠে গিয়েছিল এবং সেখানে জনৈক বিপ্লবী, তাকে পঞ্চানন চৌধুরী নামে অপর এক জন রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। কিছু দিন বাদে এই পঞ্চাননই,

নারায়ণকে কাঁকিনাড়াতে একটি বোমা ছোঁড়ার কাজে নিযুক্ত করেছিল। টিগেলের রিপোর্টে কালীপ্রসাদ ব্যানার্জী, হেমচন্দ্র খাসনবিশ, জ্ঞানেন্দ্র মোহন শিকদার, হরিদাস গাঙ্গুলি, অরবিন্দ সান্যাল প্রমুখ আরো অনেকের নাম উল্লেখ করা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকে বিভিন্ন জন সভায় পাঠ করে শোনাত এবং সেই অবসরে বিপ্লবী দলগুলিতে গোপনে সদস্য সংগ্রহ করত।

বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল বে আইনি সংস্থা রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ভাঁড়িয়ে গুপ্ত সমিতিগুলির জন্য কর্মী সংগ্রহ করত, টিগেলের রিপোর্টের নানা স্থানে তাদের নামও উল্লেখ করা হয়। ১৬৭ সি ফাইলে বজ্রযোগিনীর মিশন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ জার্মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ১৪৮ সি ফাইলে যতীন্দ্র মোহন রায় নামে অপর এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত একটি আখড়ায় যোগ দেন। এই আখড়ায় বেলুড়ের অনুকরণে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব পালন করা হত। ১৫৩ সি ফাইলে উল্লিখিত ধীরেন্দ্র ঘটক রাজশাহীতে সন্ধ্যা 'সম্মিলনী' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন এবং এইখানে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুকরণে যাবতীয় উৎসবাদি পালন করা হত। পুলিশ ধীরেন্দ্রর প্রতিষ্ঠানটিকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখত। ৩০০ সি ফাইলে, ১১৪নং মসজিদ বাড়ি ষ্ট্রীটের 'রামকৃষ্ণ পাঠশালা'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পাঠশালার শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, গ্রে ষ্ট্রীট অনুশীলন সমিতি-র একজন সদস্য ছিলেন। পাঠশালা বাড়ীটিতে মনোরঞ্জন গুপ্ত নামক জনৈক বিপ্লবী রাত্রিবাস করতেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল।

টিগেলের রিপোর্টে কুলচাঁদ সিংহরায় নামে অপর একজন রাজনৈতিক কর্মীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ব্যক্তিটি আমেরিকার গদর দল ও বাংলা দেশের বিপ্লবিগণের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতেন। ১৯১০ সালের কোন এক দিনে ইনি কলকাতা থেকে প্রায় জনা চল্লিশ বালককে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় মঠ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এই ব্যক্তির হেপাজত থেকে পুলিশ একটি ব্যক্তিগত ডায়েরি উদ্ধার করেছিল। এই ডায়েরিতে মাখন সেন, অতুল সেন, জ্ঞান ব্রহ্মচারী এবং স্বামী নির্মলানন্দের প্রসঙ্গ বারে বারে উল্লিখিত হয়েছিল। মনে হয় স্বামী নির্মলানন্দের কাজের ধারা কুলচাঁদকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। স্বামী নির্মলানন্দ সকলকে প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়াম করার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি ছাত্রদের উচ্চতর যন্ত্রবিদ্যা (higher mecha-

nics) অধ্যয়নের কথাও বলতেন। ইনি আশ্রমে স্বস্থ ও সবল বালককর্মী সংগ্রহে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এঁর একটি বাণী কুলচাঁদের ডায়েরিতে লেখা ছিল। আশ্রমের বালক ভক্তদের সমাবেশে নির্মলানন্দ নাকি একবার তাদের বলেছিলেন, "এই মঠ তোমরাই ব্যবহার করবে। দেশের মুক্তি ত সামান্য কথা, তোমরা ইচ্ছে করলে গোটা দুনিয়াকেই স্বাধীন করতে সক্ষম।" এ ধরনের উক্তি প্রকারান্তরে বালকদের বিপ্লব কর্মে যোগ দিতেই উৎসাহিত করেছিল।

টিগুলের রিপোর্ট সম্পর্কে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। টাইপ করা কাগজের প্রায় বারোটি পৃষ্ঠায় এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছিল, এতে কিঞ্চিদধিক, আড়াই হাজার শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং অন্তত ছত্রিশটি বিভিন্ন ফাইলের উল্লেখ এই রিপোর্টে পাওয়া যায়। কার্মাইকেল দরবার বক্তৃতা দেওয়ার অব্যবহিত পরেই এই রিপোর্টটি সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে কার্মাইকেল তাঁর বক্তৃতায় মিশনকে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করার অনেক আগে থেকেই সরকার গোপনে গোপনে মিশনের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত সমুদয় তথ্য সাজিয়ে রাখছিলেন যাতে প্রয়োজন হলে সরকারী অভিযোগ-গুলি সপ্রমাণ করতে সরকারের কোন বেগ পেতে না হয়। ব্যাপারটা সেই ভাবেই ঘটেছিল। কার্মাইকেলের বক্তৃতার প্রতিবাদ করে সারদানন্দ যে মুহূর্তে প্রতিবাদপত্র পাঠান তার পরক্ষণেই বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারী তাঁর দপ্তর থেকে এই সকল তথ্য-প্রমাণ একের পর এক হাজির করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে টিগুলের রিপোর্ট, তারপরে চিফ্ সেক্রেটারীর নিজের নোট। এই নোটটি লায়নের কাছে ১৯১৭ সালের ২রা মার্চ তারিখে পাঠানো হয়। টাইপ করা কাগজের সাত পৃষ্ঠা ব্যাপী এই দীর্ঘ নোটে স্টিফেনসন প্রায় সতেরশো শব্দ ব্যবহার করেন। এটি প্রধানত টেগার্ট ও টিগুলের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল।

এই নোটে মিশনের ১২ই জানুয়ারি (১৯১৭) তারিখের প্রতিবাদ পত্রের যুক্তিগুলি খণ্ডন করা হয়েছিল। স্টিফেনসন বলেন যে, মিশনের স্মারকপত্র উল্লিখিত ২০১ জন সদস্যের মধ্যে যে কেউ রাজনৈতিক কর্মী নেই এ কথা বলা নিতান্তই অবান্তর। আসলে গভর্নরও কিন্তু এ কথা কোথাও বলেন নি যে, মিশন প্রকাশ্যেই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মীদের আশ্রয় দিয়ে থাকে। মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার দরুণ কেউ বিপ্লবী হয়েছেন এমন অভিযোগও কোথাও করা

হয়নি। বস্তুত কার্মাইকেল এর বিপরীত কথাই বলতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁর মতে, এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা বিপ্লবী বলেই মিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছিলেন—"It is not for a moment suggested that these men are revolutionaries because of their connection with the Ramakrishna Mission, but I think there is reason to suppose that in many cases they belonged to the Mission because they were revolutionaries."

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে টেগার্ট যে গোপন রিপোর্টটি পেশ করেছিলেন, তার পৃষ্ঠা ১৩-২৩ এবং ২৫ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে ষ্টিফেনসন বলেন যে, মিশনের সঙ্গে একদল প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কর্মী বরাবরই যুক্ত ছিল। বাংলা সরকারের লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী টিগুলের গোপন রিপোর্টেও এই অভিযোগ সমর্থিত হয়েছে। তাছাড়া বিপ্লব কর্মে জড়িত থাকার অপরাধে যাদের সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যেও অনেকে এ কথা কবুল করেছে যে মিশনের নাম নিয়েই একদল লোক তাদের এই চক্রে টেনে এনেছে এবং সর্বনাশের আগের মুহূর্ত পর্যন্তও তাদের বিশ্বাস ছিল যে, যা কিছু তারা করেছে তা সব মিশনেরই কাজ। ষ্টিফেনসন, বিবেকানন্দের মতাদর্শ ও চিন্তা-ধারাও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান যে, বিবেকানন্দের আদর্শ যৎ-কিঞ্চিৎ বিকৃত করে অরবিন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ক্রিয়াকাণ্ডে উস্কানি দিয়ে এসেছেন। অল্প কিছু দিন আগেও কয়েকজন ফেরার রাজনৈতিক কর্মী মিশনে এসে গোপনে আশ্রয় নিয়েছিল এবং এই সংবাদ সম্প্রতি জানা গিয়েছে। এমতাবস্থায় মিশন কর্তৃপক্ষ কাগজে দু-একটি বিবৃতি দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেন না।[৮] এ বিষয়ে তাঁদের আরও সাবধান হতে হবে, তবেই তাঁরা রাজনীতির ব্যাপারে নিজেদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে পারবেন।

নোটের শেষে ষ্টিফেনসন বলেন যে, মিশন কর্তৃক প্রদত্ত স্মারক-পত্রের জবাবে গভর্নর মিশনের প্রতি সরকারের সহানুভূতির কথা জানিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে জন-সাধারণের অর্থ সাহায্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে মিশনের নিকট একটি চিঠি দিতে পারেন। কিন্তু সেই সঙ্গে গভর্নরকে এ কথাও জানিয়ে দিতে হবে যে মিশনকে রাজনৈতিক কাজের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার যে আশঙ্কা রয়ে গিয়েছে সে ব্যাপারেও

কর্তৃপক্ষ যেন উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। মিশনের তরফে গভর্নরকে এই সময় বেলুড় মঠ ঘুরিয়ে দেখানোর যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, স্টিফেনসনের নোটে সেই প্রসঙ্গেও মন্তব্য করা হয়েছে। স্টিফেনসন জানান যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দের মতাদর্শ সম্পর্কে অনুমোদন জ্ঞাপক কোন কাজ গভর্নরের পক্ষে করা মোটেই উচিত হবেনা। কিন্তু তিনি যদি এখন বেলুড় মঠ পরিদর্শনে যান তাহলে প্রকারান্তরে সেই ব্যাপারটাই ঘটবে। অর্থাৎ লোকে ভাববে যে মিশনের সব ব্যাপারেই সরকারের পুরোপুরি সমর্থন আছে। অতয়েব এখন গভর্নর যেন মিশনের এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

"I would strongly deprecate any action that could be interpreted as official approval of Swami Vivekananda's teachings and a visit to the Belur Math under the present circumstances would I feel be so interpreted. I do not mean to urge in any way that Vivekananda's teachings are in themselves seditious or harmful. But they are at present the recognised first step to initiation in revolutionary ideas; and anything that could be pointed to show that Government approved of them would facilitate the success of the recruiter."

স্টিফেনসনের উপরোক্ত ফাইল নোটটি পাঠ করে ঠিক দু দিন পরে অর্থাৎ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ তারিখে লায়ন, কার্মাইকেলের অবগতির জন্য তাঁর নিজস্ব নোটটি পাঠিয়ে দেন। এই নোটেও গভর্নর যাতে বেলুড় মঠে না যান তার জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মত প্রকাশ করা হয়। মূল বিষয় সমূহে লায়ন ও স্টিফেনসন এক মত হন। তবে মিশনের দেওয়া স্মারক পত্রের জবাবে লায়ন গভর্নরকে রীতিমত আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ ফর্মাল ধরনের একটি উত্তর পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, গভর্নর বরং এই মর্মে লিখুন যে, দরবার বক্তৃতার সকল অংশ সতর্ক ভাবে পাঠ করার পর তাঁর মনে হয়েছে যে এগুলি সংশোধন করার কোন যুক্তি নেই এবং সঠিক তথ্যের দ্বারা সমর্থিত সংবাদের ভিত্তিতে জন সাধারণের উদ্দেশ্যে যে সাবধান বাণী দরবার বক্তৃতার অবকাশে উচ্চারণ করা হয়েছে, তিনি আশা করেন তা মিশনের মঙ্গল সাধন করবে এবং এর ফলে সাধারণের মনে যদি সাময়িক ভাবে কোন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তা অচিরাৎ কেটেও যাবে :

"...H. E. has carefully considered again the words of his speech in the light of the representation now made and finds nothing that he can alter or qualify, he believes that the warning he conveyed to the public was in the best interests of the Mission itself, and he knows it to have been justified by facts; and he has no doubt that the members of the Mission will have little difficulty in controverting any misinterpretation of his words that may have gained temporary currency."

বিতর্কের পর্ব এইখানেই শেষ। অভিযুক্ত রামকৃষ্ণ মিশনের মুখরক্ষার জন্য কার্মাইকেল শেষ পর্যন্ত মিশনকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন (তাং ৬-৩-১৯১৭)। কিন্তু সে চিঠিতে বাস্তবিক কতটুকু মুখরক্ষা হয়েছিল সেটিই ভেবে দেখার বিষয়। বস্তুত কার্মাইকেল, স্টিফেনসন এবং লায়নের পরামর্শ মতই তাঁর চিঠির বয়ান প্রস্তুত করেছিলেন। সে চিঠিতে মিশনের প্রার্থনা পূরণ হয়নি। কার্মাইকেল জানান, মিশনকে অভিযুক্ত করার জন্য তিনি দরবার বক্তৃতায় মিশনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। বস্তুত এই প্রতিষ্ঠানের দাতব্য এবং সেবা কর্মে তাঁর চিরকালই আস্থা রয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে মিশনের সেবাকর্মী হিসেবে ভেক ধরে অনেকেই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিশনের নাম নিয়ে সদস্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত আছে। মিশনের কাজে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি শ্রদ্ধাশীল বলেই মিশনকে তিনি এই বিপদ সম্পর্কে দরবার বক্তৃতার অবকাশে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

অর্থাৎ গভর্নরের তরফে সৌজন্য প্রকাশে কোন ত্রুটি ঘটেনি। কিন্তু অবস্থা যা ছিল তা-ই রয়ে গেল। মিশনের বিরুদ্ধে রাজনীতি করা নিয়ে যে অভিযোগ এবং তির্যক মন্তব্য করা হয়েছিল তার কোন প্রতিকার বিধান সম্ভব হলনা।

তথ্য সূত্র

১ Majumder, R. C., *History of the Freedom Movement in India, vol. 2., Calcutta, 1975, p. 459.*

২ Govt. of Bengal, Confidential, Political Deptt. Spl. I. B. Branch. File no. 121 C/1917. *His Excellency's Speech at*

the Durbar in Government House, Calcutta, on 11th December 1916. p. 2.

৩ এই সকল চিঠি-পত্র ও গোপন নোট ২নং টীকায় উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত আছে। এই ফাইলটিতে ১৯১২ সালের ১৪ই অক্টোবরে সেকালের ইংরাজী দৈনিক 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এ প্রকাশিত রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে লেখা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের কথাও উল্লেখ করা হয়। হিন্দু প্যাট্রিয়টের ঐ সংখ্যাটি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে মাইক্রো ফিল্ম করে রাখা হয়েছে।

৪ কানুনগো হেমচন্দ্র, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, কলকাতা, ১৯২৮, পৃঃ ১৪

৫ অঙ্গীকার পত্রের বয়ান ছিল এই রকম :

"I do hereby solemnly declare that I am in no way connected with any society or body of men—individual or individuals, whom I know to cherish any unlawful political purpose or act in any unlawful way against the Government established by law in this country, nor do I cherish such a purpose or act in such manner myself."

এই ঘোষণাপত্রের প্রোফর্মাটি কলকাতার গৌরাঙ্গ প্রেস থেকে ১৫-১-১৯১৭ তারিখে ছাপিয়ে আনা হয়। অনুমান করা যায় যে, কার্মাইকেল কর্তৃক অভিযুক্ত হওয়ার পরেই উল্লিখিত ঘোষণা পত্র বিলি করার আয়োজন করা হয়েছিল।

৬ বেনারস সেবা কেন্দ্রের প্রতি সরকার কিভাবে আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিলেন সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : *The Fourteenth Annual Report of the Ramakrishna Mission Home of Service at Benares for 1914*, Belur Math, Howrah, 1915. pp. 1—23.

৭ টিগেলের রিপোর্টের প্রায় পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদের জন্য বর্তমান গ্রন্থকার রচিত "রামকৃষ্ণ মিশন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন : টিগেলের ফাইল" শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। এটি 'শিলাদিত্য' মাসিক সাহিত্য পত্রিকা (কলকাতা) ফাল্গুন ১৩৮৯—মার্চ ১৯৮৩ সংখ্যায় (পৃঃ ৬-১১) প্রকাশিত হয়।

৮ সেকালের ইংরাজি দৈনিকগুলিতে স্বামী সারদানন্দ ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে 'A Warning to the public' শীর্ষক একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

আলিপুর বোমা মামলার বিচারকালে বিচারপতি জেঙ্কিন্স (Sir Lawrence Jenkins) মন্তব্য করেছিলেন যে এই ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত আসামীরা প্রায় সকলেই ছিলেন শিক্ষিত এবং ধর্মভাবাপন্ন মানুষ।[১] জেঙ্কিন্স খাঁটি কথাই বলেছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলনের যে পর্বটিকে সচরাচর সন্ত্রাসবাদের যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়, সেই আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা ও কর্মিগণ মনে প্রাণে ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এবং দেশোদ্ধারের কর্মকে তাঁরা ঈশ্বরোপসনার অঙ্গ হিসেবে মনে করতেন। বাংলা দেশের এক জন প্রবীণ বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী বলেন, "কমিউনিজমের ঢেউ আসবার পূর্ব পর্যন্ত সব বিপ্লবীই religious minded (অর্থাৎ ধর্ম মনোভাবাপন্ন) ছিলেন।"[২] বস্তুত রাজনৈতিক আন্দোলনে ধর্ম এক সময়ে প্রায় প্রতিটি জাতিকেই কোন না কোন ভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব আরো স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়।[৩] এ দেশের ইংরাজ শাসকেরা ব্যাপারটি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন, তাই শুধু রামকৃষ্ণ মিশন নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে এ দেশের সাধু সন্ন্যাসীরা সাধারণ ভাবে কি পরিমাণে লিপ্ত ছিলেন সে বিষয়ে তাঁরা বরাবরই গোপনে গোপনে খোঁজ খবর রাখতেন। পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ এবং স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের একাধিক গোপন রিপোর্টে এ বিষয়ে নানা রকম তথ্য সম্বলিত বহু রেকর্ড সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।[৪] এই সকল রিপোর্টের মূল বক্তব্য হল এই যে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সাধু-সন্ন্যাসীদের নিযুক্ত করা কোন নতুন ঘটনা নয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় এই বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়া হয়েছে। দাক্ষিণাত্য (Deccan) এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে সন্ন্যাসীদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আবিষ্কার করা গিয়েছিল। গোখেলের 'সারভ্যান্ট্‌স অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'-ও পুনাতে রাজনীতির প্রয়োজনে সাধুদের কাজে লাগানোর জন্য তাঁদের গোপনে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। লালা লাজপৎ রায়, লাহোরের কাছে গোখেলের অনুকরণে এই

রকম একটি সন্ন্যাসীদের জন্য শিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আর্য সমাজের সন্ন্যাসীদের জন্য হরিদ্বার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই রকম কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাও করা হয়েছিল। টহলরাম নামক জনৈক আর্য সমাজী ১৯০৪ সালে সাধুদের দিয়ে রাজনৈতিক কাজ সিদ্ধ করার জন্য আর একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর এই প্রয়াস বিশেষ সফল হয়নি। শিবজ্ঞানী আচার্য নামক আর এক জন প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী মথুরায় 'শান্তি আশ্রম' নামে এই রকম একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই কেন্দ্রের সদস্যরা ধর্ম ও সেবা কাজের আড়ালে যাতে রাজনৈতিক প্রচার কর্ম চালিয়ে যেতে পারে সেই রকম পরিকল্পনা করা হয়েছিল। হরিদ্বারে দর্শনানন্দ নামে আর একজন সাধু এই একই উদ্দেশ্যে আরও একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে সাধুদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এই রকম যতগুলি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল, পুলিশের মতে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠ। এই মঠে শিক্ষণ প্রাপ্ত সন্ন্যাসীদের দিয়ে সব চেয়ে ব্যাপক ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন ও গোপন প্রচার কার্য চালানো হত।[৫]

পুলিশের রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে গোপনে যে সব অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে সেগুলি প্রকাশ্যেও ঘোষণা করেছিলেন। ১৯১৮ সালের সিডিশন কমিটির রিপোর্টে, বাংলা দেশের বিপ্লব আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বর্ণনা কালে বিচারপতি রাউলাট্ (S. A. T. Rowlatt) শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করেন। কমিটির মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের সংকীর্ণতামুক্ত, উন্নত মানবতাবাদী ধর্মচিন্তা এবং স্বামীজীর শক্তি সাধনা ও বেদান্ত ধর্ম বিপ্লবীদের প্রেরণা যোগাত। স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারাকে শিক্ষিত ভারতবাসী সমাজে বিপুলভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এঁদের মতাদর্শ নানা ভাবে বিকৃত করে বারীণ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতারা নিজেদের গোপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য সেগুলি ব্যাপক ভাবে প্রচার করতেন :

Vivekananda died in 1902 ; but his writings and teachings survived him, have been popularised by the Rama-Krishna Mission and have deeply impressed many educated Hindus. From much evidence before us it is apparent that

this inflence was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere suitable for the execution of their projects.[৬]

রাউলাট কমিটি অনুসন্ধানের কাজে বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মীর সাক্ষ্য ও জবানবন্দী পর্যালোচনা করেন এবং এগুলি থেকে জানা যায় যে, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীণ ঘোষ প্রমুখ সন্ত্রাসবাদী নেতারা ইংরেজের বিরুদ্ধে সহিংস রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করার জন্য দেশের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও স্কুল-কলেজের বালকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। উপেন্দ্র ব্যানার্জী এ কথা স্পষ্টতই স্বীকার করেন যে, যেহেতু এ দেশে ধর্মীয় প্রেরণা ব্যাতিরেকে দেশবাসীকে কোন বড় কাজে উদ্যোগী করা যায় না, সেই কারণে তাঁরা ইংরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য দেশের সাধু সমাজের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন, স্কুল-কলেজের বালকদেরও তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ে আকর্ষণ করার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেছিলেন।[৭]

সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যে কথা স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, তার অন্তর্নিহিত সত্য পুলিশ বহু আগেই টের পেয়েছিল। তারা বিশ্বাস করত যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশেষ করে স্বামীজীর চিন্তাধারা বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মে উৎসাহিত করত এবং রামকৃষ্ণ মিশনও নানা ভাবে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে বা তাদের প্রচার কর্মে সাহায্য করে, বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। মিশন সম্পর্কে ইংরাজের পুলিশের এই সন্দেহ হয়ত কিছুটা অতিরঞ্জিত ছিল, কিন্তু তা যে একেবারে অমূলক ছিলনা তার প্রমাণ এই যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার বহু পরে এক কালের নাম করা বিভিন্ন বিপ্লবী নেতারা নানা প্রসঙ্গে কথোপকথনের সময় নিজেরাই পুলিশের এই সন্দেহের যথার্থতা স্বীকার করে গিয়েছেন। প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ মাত্র কিছু দিন আগে মিশনের বর্তমান একজন সন্ন্যাসীর কাছে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, ভগ্নী নিবেদিতা, শ্রীসারদামণি দেবী তথা সমগ্র রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ আন্দোলন, সেকালের বিপ্লবী যুব শক্তিকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল সে বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করেন।[৮] শ্রীঘোষ তাঁর স্মৃতিচারণে সারদামণি দেবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে পুলিশের কাছে তাড়া খাওয়া বিপ্লবীদের বেলুড় মঠে মাঝে মাঝে আশ্রয় দেওয়া হত এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল সারদামণি

দেবীর আগ্রহাতিশয্যে। রাজনীতি করার জন্য নিবেদিতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে মিশনের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরেও সারদামণি দেবী তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত সারদামণি দেবীর জন্যই মিশন থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরেও নিবেদিতা ও মিশনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে কোন চিড় ধরেনি। হেমচন্দ্র, নিবেদিতার প্রসঙ্গটি সবিস্তারে উল্লেখ করে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, নিবেদিতা যে ভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন তার ফলে নিবেদিতার সঙ্গে প্রকাশ্যে সম্পর্ক ছিন্ন না করলে মিশনকে সেই শৈশব অবস্থাতেই রাজরোষে পড়তে হত এবং তার জন্যে মিশন হয়ত অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হত। সুতরাং ইংরাজীতে যাকে expediency বলে, অনেকটা সেই কারণেই মিশন লোক দেখানো ব্যপার হিসেবে নিবেদিতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে। নিবেদিতার বহিষ্কারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে যুগের তরুণ বিপ্লবী সমাজে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে নানা রকম ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পরে, পরিণত বয়সে হেমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে নিবেদিতা সম্পর্কে মিশনের সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত (যার পিছনে, হেমচন্দ্রের মতে সারদামণি দেবীরও হাত ছিল) যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব সম্মত হয়েছিল। বস্তুত মিশন থেকে চলে যাওয়ার পরেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ মঠের সন্ন্যাসিগণের সঙ্গে নিবেদিতার পূর্বের সম্পর্ক অটুট ছিল। হেমচন্দ্র বলেছেন বিপ্লবীদের প্রতি সারদামণি দেবীর বিশেষ একটা স্নেহের সম্পর্ক ছিল। দেবব্রত বসু ও শচীন সেনের মত বিখ্যাত বিপ্লবীদের মঠে যোগদানের ব্যাপারে তখনকার মঠ কর্তৃপক্ষ প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু সারদামণি দেবীই এঁদের মঠে যোগদানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই এঁরা মঠে স্থান পেয়েছিলেন। অনুরূপ ভাবে নিবেদিতাকেও তিনি সর্বদা সস্নেহ প্রশ্রয় দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। রাজনীতির কারণে নিবেদিতাকে মঠ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে তিনি নিজে কখনও নিবেদিতাকে বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলেননি।[৯]

হেমচন্দ্রের মত আরো দু জন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশনের কি ধরনের যোগাযোগ ছিল সে কথা ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। শ্রীঅশ্বিনী কুমার গাঙ্গুলী বলেন যে, তখনকার দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সকলেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বাঘা যতীন, যাদুগোপাল মুখার্জী, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি সবাই স্বামীজীর দ্বারা বিশেষ-

ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীগাঙ্গুলী আরো বলেন, "রামকৃষ্ণ মিশন বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান প্রেরণাস্থল এবং আশ্রয়দাতা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বেলুড় মঠ, কাঁকুড়গাছি, বারাণসী প্রভৃতি মিশনের কেন্দ্রে বিভিন্ন উৎসবে আমরা বিপ্লবীরা, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতাম। অনেক বিপ্লবী পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেজন্যে মিশনকে ব্রিটিশ সরকার খুব সন্দেহের চোখে দেখত।"[১০]

বর্তমানে জীবিত এক কালের বিপ্লবী নেতা শ্রীজীবনতারা হালদার-ও, শ্রীগাঙ্গুলীর মত সমর্থন করেন। বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি শ্রীকালী চরণ ঘোষ-এর লেখা "জাগরণ ও বিস্ফোরণ" শীর্ষক বইটির প্রথম খণ্ডের ৬৮-৭০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: "স্বামীজী স্বয়ং ভারতের মুক্তির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। দেশীয় রাজন্যবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বিদেশী অস্ত্র নির্মাতার নিকট হতে হাতিয়ার সংগ্রহ দ্বারা তিনি সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন।" মিশনের সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগের কথা বলতে গিয়ে শ্রীহালদার আরও মন্তব্য করেন: "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্যায়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠতা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিশনের সাধুরা প্রকাশ্যেই সাহচর্য দিয়েছেন নৈতিক সমর্থন যুগিয়েছেন এবং বহু বিপ্লবীকে আশ্রয় দিয়েছেন। ...এই সকল কারণে মিশনকে রাজরোষে পড়তে হয়েছিল... (এবং) এক সময়ে গভর্নমেণ্ট মিশনকে বেআইনী ঘোষণা করে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত করেছিল।"[১১]

শ্রীহালদার মিশনকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকারী মহলে গোপন তৎপরতার কথা উল্লেখ করেন। সংবাদটি নিঃসন্দেহে সকলের মনেই বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করে। কিন্তু সরকারী নথি পত্র অনুসন্ধান করে সংবাদটির সত্যাসত্য যাচাই করতে বর্তমান গ্রন্থকাব ব্যর্থ হয়েছেন। তবে এ বিষয়ে সদ্য প্রয়াত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার একটি বাংলা পত্রিকায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। শ্রীমজুমদার লিখিত প্রবন্ধটির নাম, "স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন" প্রবন্ধটি আলোচ্য বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করায় সেটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হল। শ্রীমজুমদার লেখেন:

"ভারত সরকার যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রামানিক ইতিহাস

প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন তখন ইহার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। আমাকে এই গ্রন্থের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এই পদ গ্রহণ করিবার পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম যে এ বিষয়ে ভারত সরকারের গোপন দপ্তরে যত চিঠিপত্র বা দলিলাদি আছে তাহা আমাকে দেখিতে দিতে হইবে। শুনিয়াছি যে এই সংবাদ পাইয়া এ দেশীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাদের সম্বন্ধে ফাইলগুলি অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করাইয়াছিলেন। ইহার একমাত্র কারণ মনে হয় যে তাঁহারা যে সমুদয় গোপনীয় সংবাদ ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে দিয়াছিলেন তাহা যেন সাধারণে জানিতে না পারে।

একদিন এইরূপ একটি গোপনীয় ফাইলের উপর দেখিলাম লেখা আছে "রামকৃষ্ণ মিশন"। আমি একটু আশ্চর্য বোধ করিয়া ফাইলটি আমার বসিবার ঘরে নিয়া পড়িতে লাগিলাম। ফাইলের সর্ব নিম্নতলে একটি পুলিশ রিপোর্ট আছে—তাহাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে রামকৃষ্ণ মিশনের ৮।১০ জন সাধু পূর্ব জীবনে বিপ্লবী এবং গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন। কেহ কেহ ডাকাতি করিয়াছেন এবং নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করিতেন।

তাঁহাদের পূর্বেকার এবং বর্তমান সাধু অবস্থার নামও দেওয়া আছে। ইহার অনেক প্রমাণও ওই ফাইলে ছিল। এই বিবরণের পর কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা এ বিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও পর পর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। সর্ব শেষে সেক্রেটারী এই সব মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া বড়লাটের কাছে পাঠাইবার সময় প্রস্তাব করিলেন যে বেলুড় মঠকে বেআইনি ঘোষণা করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

এই সব মন্তব্য পরিয়া বড় লাট ফাইলে লিখিয়াছেন: পুলিশের রিপোর্ট ও সেক্রেটারীর মন্তব্য খুব সম্ভব বেলুড় কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিয়াছেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একজন আমেরিকান মহিলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, যদি বেলুড় মঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আমেরিকায় ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে। এ সময় (খুব সম্ভব বিশ্বযুদ্ধে যখন বিপন্ন ইরেজ আমেরিকার সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন) কোন রকমে আমেরিকার বিরুদ্ধভাজন হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং বেলুড় মঠ বন্ধ না করিয়া সাদা পোষাকে কয়েকজন পুলিশ

কর্মচারীকে সদা সর্বদা বেলুড় মঠে নিযুক্ত করা হউক। যে সমুদয় বিপ্লবীদের নাম পূর্বোক্ত পুলিশের বিবরণীতে আছে তাহাদের মধ্যে যাহারা মঠে আছে তাহাদের গতিবিধির উপর যেন কড়া নজর রাখা হয়।'

ফাইলটি এখানেই শেষ হইয়াছে। খুব সম্ভব বড় লাটের নির্দেশ মতই কাজ করা হইয়াছিল।

ইহার মাস দুই পরে আমি বেলুড় মঠে যাই। গুপ্ত পুলিশের রিপোর্টে যে সব সাধুদের নাম ছিল তাঁহাদের দুই তিন জনকে আমি জানিতাম। তাঁহাদিগকে গোপনে পুলিশ রিপোর্টের কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে সত্য সত্যই কি তাঁহারা গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সভ্য ছিলেন? তাঁহারা মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিলাম না।[১২]

বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ কেহ যে পরবর্তী কালে ধর্ম সাধনা করিতেন ইহা পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, এখন তাহার পরিষ্কার ও প্রতক্ষ্য প্রমাণ পাইলাম। আমাদের সহিংস বিপ্লবীদের মধ্যেও যে অনেক প্রকৃত ধার্মিক লোক ছিলেন ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিলাম।"

উপরে উদ্ধৃত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র বর্ণিত বিবরণী থেকে সরকার রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে কি পরিমাণ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন সেই তথ্য পুরোপুরি জানা যায়। শ্রীমজুমদার, মিশনের উপর সাদা পুলিশের নজরদারি রাখার জন্য সরকারের উর্ধ্বতন মহলে যে গোপন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেই তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। ১৯১৭ সালের ৭ই এপ্রিলে লায়নের কাছে লেখা সারদানন্দের একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে, এই বিষয়ে আরো চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটনা জানা গিয়েছে। এই চিঠি থেকে জানা যায় যে উল্লিখিত সময়ে সরকারী নির্দেশে বেলুড়ের উপর চোখ রাখবার জন্য কিছু সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এই ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর সারদানন্দের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ ঐ প্রহরা তুলে নিয়েছিলেন। উল্লিখিত চিঠিতে সারদানন্দের অনুরোধে সরকার কি পরিস্থিতিতে এই প্রহরা তুলে নিয়েছিলেন সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

বস্তুত মিশনের উপর সরকারের পুলিশের এই ক্রমবর্ধমান নজরদারির ঠেলায় মিশনের সদস্যগণ ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। মিশনের দ্বিতীয়

সাধারণ রিপোর্টে বলা হয় যে, ১৯০৮ সাল পর্যন্ত মিশন বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু মঠ ও মিশনের ইতিহাস রচয়িতা স্বামী গম্ভীরানন্দ অন্য কথা বলেন। তাঁর মতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই, এমন কি তারও কিছু আগে থেকে পুলিশ মিশনকে চোখে চোখে রাখতে আরম্ভ করে। বেলুড়ে আগত বিদেশ থেকে লেখা সব চিঠি পত্র সরকারের উদ্যোগে গোপনে খোলা হত এবং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে মিশনের সদস্যদের ভাল করে কাজ করাই দায় হয়ে উঠেছিল। অবশ্য মিশনের কাজ কর্ম সম্পর্কে এইভাবে গোপন অনুসন্ধান চালিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত মিশনের সাধু উদ্দেশ্য সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছিলেন।"[১৩] স্বামী গম্ভীরানন্দ একদিনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, মিশনকে রাজনীতির কাজে টেনে আনবার জন্য যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন এমন দুজন বিপ্লবী স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে কোন সময়ে নিজেরাই সরকারের কাছে কবুল করেছিলেন যে মিশনকে তাঁরা কোন ভাবেই রাজনীতির কাজে ভিড়াতে পারেন নি। এই ঘটনার ফলে মিশন সম্পর্কে সরকারের নীতি হয়ত কিছু কালের জন্য একটু নমনীয় হয়েছিল। কিন্তু খুব বেশী দিন এই মনোভাব স্থায়ী হয়নি। আসলে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি না করলেও মিশনের সন্ন্যাসীরাও রক্ত মাংসের মানুষ, দেশাত্মবোধের প্রেরণা তাঁদেরও উদ্বেল করত। সরকারী দমন নীতির বাড়াবাড়ি দেখলে শত নিস্পৃহতা সত্ত্বেও, তাঁরা মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ এই রকম একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯১৭-১৮ সালের মাঝে, কোন এক দিন পুলিশের মাত্রাহীন বর্বরতার কথা শুনে স্বামী প্রেমানন্দ ও শিবানন্দ নাকি বেলুড় মঠে বসেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু ভৎর্সনা সূচক মন্তব্য করেছিলেন। এই সব ঘটনা সরকারকে মিশনের প্রতি আবারও বিরূপ করে তুলেছিল। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ এ-ও জানতেন যে স্বয়ং সারদামণি দেবীও সন্দেহভাজন বিপ্লবী কর্মীদের মঠে আশ্রয় দিতে বিশেষ ভাবে আগ্রহী। অতয়েব এটা খুবই স্বাভাবিক যে সরকার মিশনকে কখনই চোখের আড়াল করতে চাইবেন না এবং বাস্তবে তাঁরা ঠিক তাই-ই করেছিলেন। মিশন ত সামান্য কথা, তাঁরা এমন কি সারদামণি দেবীর গ্রামের বাড়ীতেও পুলিশের গোপন প্রহরা মোতায়েন রেখেছিলেন।[১৪]

মিশনের কাজ কর্মের সঙ্গে পরিচিত আজকের যুগের কোন লোক ভাবতেই পারেননা সরকার কি করে মিশনের এই কল্যাণকর্মের পিছনে রাজনৈতিক

অভিসন্ধির অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন। কিন্তু সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হবেনা। আসলে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি না করলেও মিশনের সঙ্গে বিপ্লবীদের যে একটা গোপন যোগাযোগ ছিল এই সত্য পুলিশের অজানা ছিলনা। জাতীয় চেতনা সৃষ্টিতে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কেও সরকার সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তার উপরে মিশনারীরা এবং তাঁদের ভারতীয় সমর্থকগণ মিশনের বিভিন্ন কাজের উপর রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করে সরকারকে মিশন সম্পর্কে যার পর নাই সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। এমতাবস্থায় সরকার মিশন এবং তার প্রাণ পুরুষ বিবেকানন্দ সম্পর্কে স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহাকুল হয়ে ওঠে। ২২ মে ১৮৯৮ তারিখে নিবেদিতা তাঁর এক বান্ধবীকে লেখেন—

> "আজ সকালে সন্ন্যাসীদের একজন সতর্কবাণী শুনেছেন পুলিশ, গোয়েন্দা-মারফত স্বামীজীর উপরে নজর রাখছে। ব্যাপারটা সাধারণ ভাবে অবশ্য আমরা জানতাম, কিন্তু আজকের সংবাদটি একেবারে গায়ে আঁচ লাগার মতো।...সরকার নিশ্চয় ক্ষেপে গেছে, অন্তত স্বামীজীকে যদি সে কোনোভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করে তাহলে তাই প্রমাণিত হবে। সরকারের ঐ কাজ মশালে আগুন ধরিয়ে দেবে, যা সারা দেশে আগুন ছড়াবে।"

অবশ্য সরকার মশালে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মত হঠকারিতার কাজ করেননি। তাঁরা জানতেন যে রামকৃষ্ণ মিশনের মত একটি সর্বজন প্রিয় প্রতিষ্ঠানের পিছনে হয়ত গোপনে গোয়েন্দা লেলিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু স্রেফ সন্দেহের বশে তার বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়না। মিশন সম্পর্কে সরকারের তাই বরাবরই এক ধরনের বিপরীত মানসিকতা কাজ করে এসেছিল। গোপনে মিশনের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েও সরকার প্রকাশ্যে অন্তত মিশনের জনকল্যাণমূলক কাজগুলিতে উৎসাহ দিয়ে এসেছিলেন। আকর্ষণ ও বিকর্ষণের এই মিশ্র প্রতিক্রিয়াটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে কার্মাইকেলের দরবার বক্তৃতার সময় মিশন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সন্দেহবাণী উচ্চারিত হওয়ার পর, মিশন কি ভাবে গভর্নরকে

বেলুড় মঠ ঘুরে দেখে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। পি. সি. লায়ন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ তারিখে গভর্নরের কাছে একটি গোপন ব্যক্তিগত নোটে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে গভর্নরের পক্ষে বেলুড় মঠ পরিদর্শন করতে যাওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হবে না। লায়ন লিখেছিলেন :

I would join also in deprecating with Mr. Stephenson any visit by H. E. to the Belur Math at the present time. I feel certain that in view of the fact H. E. that has so far, as I am aware never visited the math before, such action would be interpreted in a manner which would weaken the excellent effect of the Durbar speech.[১৭]

সুতরাং আমলাদের পরামর্শ ও প্ররোচনায় সে যাত্রা কার্মাইকেলের বেলুড়ে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ঘটনাটি মিশন সম্পর্কে সরকারের বিরূপ মনোভাবের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কিন্তু এর বিপরীত দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নয়। পূর্বোক্ত ঘটনার মাত্র কয়েক মাস আগে এই কার্মাইকেলই পূর্ব বঙ্গের ঢাকা শহরে মিশনের নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষ্যে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মিশনের তরফে উক্ত অনুষ্ঠানে কার্মাইকেলকে আমন্ত্রণ জানানো হলে ভারত সরকারের পদস্থ অফিসার ফ্রেঞ্চ (F. G. French) প্রথমে এ বিষয়ে গভর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারী গোর্লের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারেন যে ব্যক্তিগত ভাবে গভর্নরের এই রকম একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যেহেতু গভর্নরের উপস্থিতির একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে সেই কারণে গোর্লে, লায়ন মারফত গোয়েন্দা বিভাগ এ বিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করে সেটা আগে ভাগে যাচাই করে নেওয়ার জন্য ফ্রেঞ্চকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই পরামর্শ অনুযায়ী ফ্রেঞ্চ, লায়নকে ১৯১৬ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে একটি চিঠি (D.O. No. 628L.) লেখেন। চিঠিতে ফ্রেঞ্চ ঢাকা মিশনের নানাবিধ কল্যাণ ও সেবামূলক কাজের প্রশংসা করে জানান যে এটি বেলুড় কর্তৃক স্বীকৃত একটি সংস্থা এবং যেহেতু বেলুড় সম্পর্কে বাংলা দেশের পুলিশ সব চেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল, সেই কারণে ঢাকা মিশন সম্পর্কে তাঁদের অভিমতটি জানা একান্তই প্রয়োজন। চিঠিতে সরকারী আমলা হিসাবে মিশন সম্পর্কে ফ্রেঞ্চের যে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশিত হয়েছিল সেটি বড়ই আশ্চর্য-

জনক। ফ্রেঞ্চ লিখেছিলেন যে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি মনে করেন যে, মোটের উপর বেলুড় সহ সব কটি মিশনই মূলত দাতব্য এবং জনসেবার কাজে নিযুক্ত। অতয়েব তাদের কর্মসূচীর মধ্যে যতক্ষণ না কোন অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত গভর্নরের পক্ষে এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা সঙ্গত হবেনা। তিনি আরো জানান যে গত বছরে অনুরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠানে গভর্নর উপস্থিত ছিলেন। অতয়েব অন্তত নজিরের খাতিরেও এবারের এই অনুষ্ঠানে গভর্নরের উপস্থিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ একটি ব্যাপার স্পষ্ট—গভর্নরকে ঢাকা মিশনে পাঠানোর জন্য ফ্রেঞ্চ নিজেই রীতিমত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

ফ্রেঞ্চের উপরোক্ত চিঠিখানি যেদিন ডাকে যায় সেই দিন স্বয়ং লায়নও ঐ একই বিষয়ে কামিং-এর কাছে একটি চিঠি লেখেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি সরকারের সৌজন্য যে কি পরিমানে বিস্তৃত হয়েছিল তা প্রমাণ করার পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তাই মূল চিঠি খানি নীচে উদ্ধৃত করা হল :

Ramna (Dacca)
The 5th August, 1916.

My dear Cumming,

Please see the enclosures, concerning the Ram Krishna Mission in Dacca, and kindly let me know whether the I. B. wish to urge anything against the proposal that H.E. should show his sympathy with the Society by opening these new buildings.

No doubt it is true that many youngmen who have taken up extreme political views have been connected from time to time with this Mission. I think that this is natural. On the other hand, I do not know whether this has been the case in Dacca, as it was the case in Belur Math. I am doubtful in any case, whether such facts should lead us to withhold our support from the charitable work done by the Mission, unless we come to the conclusion that the said charitable work is only used as a cloak for the preaching of sedition.

I shall be very much obliged if you will kindly let me have a reply within the next few days, as I shall be leaving Dacca for Calcutta on the 11th, and the matter should be decided before then.

Yours sincerely,
P. C. Lyon.

চিঠিখানিতে মিশনের হয়ে লায়ন যেভাবে পক্ষ সমর্থন করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। মিশনের সঙ্গে কিছু সংখ্যক, উগ্রপন্থীদের যুক্ত হয়ে পড়াটা তাঁর চোখে অস্বাভাবিক ঠেকেনি। আবার মিশন যে যথার্থই কল্যাণকর্মের ছুতো ধরে রাজদ্রোহিতায় উস্কানি দিয়ে চলেছে এই মর্মে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত, মিশনের সেবাকর্মে সাহায্য না করা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা যে একান্তই অনভিপ্রেত, এ কথাও লায়ন স্পষ্টত স্বীকার করে গিয়েছেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই লায়নই মাত্র ছ মাস পরেই ঐ একই উদ্দেশ্যে কার্মাইকেলের বেলুড় ভ্রমণ পরিকল্পনায় বাধ সেধেছিলেন। কিন্তু সে যাই হোক, আপাতত তাঁর উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার। অর্থাৎ ফ্রেঞ্চের মত লায়নও মিশনকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কার্মাইকেলের ঢাকা যাওয়ার প্রস্তাবে সর্বান্তঃকরণে সায় দিয়েছিলেন।

কিন্তু গোয়েন্দা অফিসারদের সঙ্গে সাধারণ প্রশাসনে নিযুক্ত অফিসারদের বোধ হয় সহজে মতের মিল হয়না। লায়নের উপরোক্ত চিঠিখানি, কামিং-এর হাত ঘুরে ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চের ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল ওয়ার্ডেন (F. W. Warden)-এর কাছে এসে পৌছেছিল। প্রকৃত পক্ষে কামিং-ই গোটা ব্যাপারটি ওয়ার্ডেন কে জানিয়ে তাঁর অভিমত সংগ্রহের জন্য পত্রালাপ করেছিলেন। এতে হিতে বিপরীত ফল হয়েছিল। এই চিঠির জবাবে ওয়ার্ডেন যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা যেমন ছিল অপ্রত্যাশিত, তেমনই অন্যান্য সকল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মতামতের সম্পূর্ণ বিরোধী। ওয়ার্ডেন, লায়ন বা ফ্রেঞ্চের মতামত পুরোপুরি নাকচ করে দিয়ে ঢাকায় কার্মাইকেলের যাওয়া কোন মতেই সঙ্গত হবেনা বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। ১১ই আগস্ট ১৯১৬ তারিখে প্রস্তুত ওয়ার্ডেনের এই টাইপ করা দীর্ঘ আন্-অফিসিয়াল নোটটি আলোচ্য বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য নথি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। এই কারণে সংশ্লিষ্ট ফাইল থেকে মূল চিঠিখানি এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হল।

Addl. Secy. u/o.

Although there is nothing specific against the *Dacca* Ram Krishna Mission it was always regarded with considerable suspicion by all officers engaged on political work in Dacca. There is ample evidence to show that many revolutionary workers have pursued their errands under the cloak of the Ram Krishna Mission, but whether the latter were aware of their designs or not, it is difficult to say. There can, however, be little doubt that no real endeavour was made to prevent the misuse of the name of the Mission. This being so, the conclusion is irresistable that the Mission was privy to the designs of the revolutionary party.

At Bajragogini in Munshiganj, there is also a Ram Krishna Mission establishment. This institution was on several occassions brought to my notice as a revolutionary centre, and I tried to have it watched. How far it was affiliated with the Dacca establishment it was never clearly established, although there was evidence of members of the Dacca branch having visited the Bajragogini one. During the enquiries into the distribution of leaflets at Bajragogini in July 1915, it was ascertained that 3 Ram Krishna Mission youths from Dacca, who arrived at Bajragogini on the day preceding the distribution, went out in procession on the morning the leaflets appeared, as a 'Sankirtan' party, together with some local Ram Krishna Mission followers, and it was suspected that they had some connection with that distribution.

It is also to be remembered that the Dacca Ram Krishna Mission received visits from the Sadhus of the Belur Math, against which there is a good deal on record and the

Dacca mission authorities have always been more ardent in their celebrations of the memory of Vivekananda, whose works have done more in serving the end of sedition than any other.

An institution which is so strongly suspected by us, should not, I think, receive the patronage of His Excellency the Governor.

F. W. Warden.

ওয়ার্ডেন-এর এই দীর্ঘ নোটের মূল প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, যদিও ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে সরাসরি অভিযুক্ত করার মত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়নি তবুও তাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। প্রথমত, বিপ্লবের প্রচারকগণ এই মিশনের সাহায্যে নিজ নিজ কার্য সিদ্ধি করে এসেছেন এবং এই কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সব কাজ বন্ধ করার জন্য বিশেষ যে কিছু চেষ্টা করেছিলেন তা আদৌ মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, এই কেন্দ্রটির সঙ্গে, বিপ্লবের গোপন আড্ডা বলে যেটিকে সন্দেহ করা হত, সেই মুন্সিগঞ্জের বজ্রযোগিনী মিশনেরও প্রচ্ছন্ন সংযোগ রয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ঢাকা মিশনের অন্তত তিন জন যুবক সদস্যের সহযোগিতায় বজ্রযোগিনীর মিশনটি একদা নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিপ্লবী প্রচারপত্র সমূহ বিলি করেছিল। সব শেষে ওয়ার্ডেন এই মর্মেও অভিযোগ করেন যে, দেশবাসীর মনে ব্যাপকভাবে রাজ বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে যিনি সব চেয়ে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি উদ্‌যাপনেও ঢাকার এই মিশনটি বড় বেশী উৎসাহ দেখিয়ে এসেছে। এহেন একটি প্রতিষ্ঠান, যার সম্পর্কে পুলিশ বরাবরই তীব্র সন্দেহ পোষণ করে এসেছে, তার নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে মাননীয় বাংলার লাট বাহাদুরের উপস্থিতি কোন মতেই অভিপ্রেত হতে পারেনা। তাই ওয়ার্ডেন-এর অনুরোধ, ঢাকার মিশন কেন্দ্রের প্রতি কার্মাইকেল যেন কিছুতেই আনুকূল্য প্রদর্শন না করেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে গভর্নর ঢাকাতে যাবেন কি যাবেন না, এই বিষয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ১১ই আগস্টের মধ্যে তাঁকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য লায়ন তাঁর চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু গ্রহের ফের। ওয়ার্ডেন-এর এই নোটটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লায়নের হাতে এসে পৌঁছায় নি। এটি

যখন পাওয়া গেল তখন লায়ন ঢাকা ছেড়ে রওনা হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে অবশ্য ঐ দিনই একটি জরুরী টেলিগ্রাম করা হল। কিন্তু এত করেও ওয়ার্ডেন-এর মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি, কেননা লায়নের হাতে লেখা ১২ই আগস্টের একটি নোট থেকে জানা যায় যে, শেষ মুহূর্তে ওয়ার্ডেন-এর ঐ নোট অনুযায়ী গভর্নরকে ঢাকা পাঠানো থেকে নিরস্ত করাটা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সঙ্গত বলে মনে করেন নি।[১৮]

মোট কথা, গোয়েন্দা পুলিশ এবং প্রশাসক মহলের টানা পোড়েনে সে যাত্রা রামকৃষ্ণ মিশনেরই জয় হয়েছিল। অর্থাৎ গভর্নরের উপস্থিতির ফলে ঢাকা মিশন যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে সে কথা সে বারের মত সর্ব সাধারণের কাছে প্রতিপন্ন করা সম্ভব হয়েছিল।

পরিক্রমা অন্তে একটি কথা বলা আবশ্যক। মিশন সম্পর্কে নানা কারণে সরকার সন্দেহ পোষণ করলেও, এটি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করত এ অভিযোগ কিন্তু সরকার কখনও করেন নি। মিশন সম্পর্কে এই কথাটি সবার বড় সত্য। এ বিষয়ে জনৈক বিশেষজ্ঞের অভিমতটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> "ধর্মসঙ্ঘ রূপে রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে না স্থির করেছিল বলে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ জনপ্রিয়তা হারানোর ঝুঁকি নিয়েও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মত মহান ব্যাপারে অংশ নেয়নি, যদিও সঙ্ঘভুক্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে ঐ আন্দোলনের প্রতি প্রবল সহানুভূতি ছিল···ইসারউড বলতে চেয়েছেন, বাস্তব জন জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেও ধর্মের নিত্যজীবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ অতি ক্ষুরধার—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সেই পথে চলতে পেরেছে।"[১৯]

তথ্য সূত্র

১। Majumder Biman Behari, *Militant Nationalism in India*. Calcutta, 1966, p. 116.

২। ব্রহ্মচারী শঙ্কর, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা :-স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চোখে। সমাজ শিক্ষা, ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৭৯, পৃঃ ৮।

৩। এই প্রসঙ্গে Stephen Fuchs এর *Rebellious Prophets : A study of Messianic Movements in Indian Religions*, Bombay, 1965 নামক বইটি আগ্রহী পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন।

৪। এই সকল রেকর্ডের ভিত্তিতে শ্রী এ. কে. দত্ত State Committee for Compilation of History of Freedom Movement in India; Bengal Region এর তরফে একটি পেপার প্রস্তুত করেন। এটি কলকাতার পঃ বঙ্গ সরকারের লেখ্যাগারে সংরক্ষিত আছে।

৫। ঐ, para 23.

৬। *Report of the Sedition Committee, 1918*, Calcutta, 1973, pp. 16-17.

৭। ঐ, পৃঃ ২০-২১।

৮। ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ বিপ্লব—বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে। রাখাল বেণু, মাঘ ১৩৮৭-চৈত্র ১৩৮৮, পৃঃ ২৮২-৯৫।

৯। নিবেদিতার বহিষ্কার প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রঃ Swami Gambhirananda, *History of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission,* Calcutta, 1983, pp. 161—63.

১০। টীকা নং ২ এর অনুরূপ।

১১। ঐ, নভেম্বর ১৯১৮, পৃঃ ২৩৪-৩৫।

১২। রাখাল বেণু, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬, পৃঃ ২৯৭-৯৮। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্ভবত ম্যাকলিউড (Josephine Macleod) নামে সুপরিচিত আমেরিকান মহিলাই মিশনকে বন্ধ করে দেওয়া হলে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে আমেরিকায় প্রচার অভিযান শুরু করা হবে বলে হুমকি দিয়েছিলেন এবং ডঃ মজুমদারের মতে এতে কাজও হয়েছিল।

১৩। টীকা নং ৯ এর অনুরূপ, পৃঃ ১৬৮।

১৪। ঐ, পৃঃ ১৬৯ ও ১৭৭-৭৮

১৭। Govt. of Bengal. Confidential. Political Deptt., Spl. I. B. Branch. File no. 121C/1917.

১৮। ফ্রেঞ্চ, লায়ন এবং ওয়ার্ডেন-এর উল্লিখিত চিঠিগুলির জন্য দ্রঃ Govt. of Bengal. Confidential. Political Deptt., Political Br., File No. 117C/1916.

১৯। বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, চতুর্থ খণ্ড, ১৩৮৮, পৃঃ ৫৮

পরিশিষ্ট

(1) *Excerpts from Tegart's report. Vide The Ram Krishna Mission, Cofidential, p. 25.*

In this note, as stated at the outset, it is the political aspect of the mission to which attention has mainly been directed, and the points against the mission have been set out *seriatim* The result may be that an impression has inadvertantly been conveyed that there is not another and brighter side of the mission's work. To remove any such impression it may be said at once that it is not contended that in its essence the Ram Krishna Mission is anything but what it purports to be, a purely religious body which has undoubtedly done a great deal of good, in a humble way, in affording relief in times of distress, and at all times in giving relief gratis to the poor at the various *sevasrams* referred to above.

The Swamis, with possibly a few exceptions, do not mix themselves up in political matters. They have stated that they are anxious to exclude political suspects from their mission and have recently given evidence of their good faith in this respect by refusing admission to three members of the revolutionary party who were anxious to join, probably in order to evade the police and carry on their work under the aegis of the *math.* That the *math* authorites were on their guard against revolutionaries is apparent from a declaration form for intending members issued in

1911, in which the applicant is required to sign a declaration to the following effect: "I also declare that I have no connection whatever with any political or any secret body."

On the other hand it has been shown that the ranks of the *math* officials are not free from taint, and it is some what disconcerting to find, just at the time of compiling this note, that Saradananda's brother is himself an active and dangerous revolutionary. It has also been shown that several passages of the teachings of Swami Vivekananda are pregnant with sedition, that their potentialities for evil have been fully realized and taken advantage of by the revolutionary party, that the various recognised *maths* are resorted to by political refugees and that bogus *asrams* which are nothing but centres for the dissemination of revolutionary doctrines, have sprung up with alarming rapidity in eastern Bengal.

The authorities at Belur are apparently now fully alive to the dangerous possibilities ahead and are apparently anxious to check this perversion of their teachings as far as possible. How far they are capable of doing so is a matter on which opinions may differ. It need only be said that Saradananda remarked that if Government with all the vast power and machinery at its disposal was unable to check the spread of these revolutionary doctrines, it was hard to expect a few Swamis to stem the tide. Enquiries have, however, shown that in the past recruits have been obtained to the revolutionary party by using the name of the Ram Krishna Mission, and that some of

these rdcruits were in the first instance under the impression that they were actually joining this mission. The insidious poison then gradually injected and when the true nature of the society was eventually revealed to them they were only too ready to remain and endeavour to carry out its aims. This can at any rate be checked by the authorities at Belur if they, in season and out of season, openly dissociate themselves from politics of any kind and remove from their midst any persons who are tainted with revolutionary sentiments.

CALCUTTA, C. A. TEGART

The 22nd April 1914. Speciel Superintendent of Police, Intelligence Branch.

(2) ***Stephenson's note dated February 2, 1917, to the Hon'ble Member, P. C. Lyon vide Govt. of Bengal, Confidential, Political deptt., S. I. B. Branch, No. 121 C/1917.***

H.M.

The memorial of the Governing body of the Ram Krishna Mission may be read. The prayer is that H.E. will in some way correct the disastrous impression of the Mission which has unfortunately arisen since the Durbar speech.

The relevant portion of the Durbar speech is as follows:

"In attaining their end they use terrorism as well as persuasion, and I feel certain, I am sorry to say, that they often seize the opportunity which membership in a charitable society like the Ram Krishna Mission or

participation in the relief of distress gives them to meet and to influence boys who have noble ideas. but also have not enough experience to judge where a particular course must lead. I have the highest respect for the Ram Krishna Mission and for societies like it. I know of nothing more worthy of encouragement than the social service which these societies exist to promote, and there is nothing in India which I deplore more deeply, or of which it has been harder to convince me than the fact that mean and cruel men do join these societies in order to corrupt the minds of young men who would, if only they were not interfered with, be benefactors to their fellow country men."

The reply of the memorialists is that the Ram Krishna Mission is a religious and charitable institution with unexceptionable ideals; that they have scrutinised their list of members and found none tainted, that their list of members holds only 201 and is enlarged so slowly that there is no possibility of political conspirators using the opportunity which membership offers to corrupt the minds of youngmen and as politics are not allowed, there are no such opportunities. And lastly that there are other societies with the name Ram Krishna which are apt to be confused with them; that the Mission does take in outside workers, but only for definite periods and that if some of these are regarded as suspicious characters by the police, no blame can be attached to the Mission.

We may accept all that the Memorial says; we need not discuss the question whether any of their 201 members are tainted. There may be differences of opinion when it

comes to a question of the workings of the mind of individual swamis or the precise meaning they intended to be attached to particular words, but it may be said at once in Mr. Tegart's words—'it is not contended that in its essence the Ram Krishna Mission is anything but what it purports to be, a purely religious body which has undoubtedly done a great deal of good, in a humble way, in affording relief in times of distress, and at all times in giving medical relief to the poor at the various *sevasrams.*' (p. 25 of Red Book.)

There is nothing to the contrary either implied in H. E.'s speech; the whole point is whether the statement in that speech were justified. I think perhaps the memorialists have not grasped the position clearly or at all events have not stated it clearly.

I would invite attention to pp. 13-23 of the Red Book as compiled in April 1914 by Mr. Tegart. The facts embodied there were laid before and discussed with Saradananda Swami; the Secretary and it was in consequence of these discussions that the Mission issued their warning to the public in April 1914 which is attached to their petition.

The position as it seems to me is this. Swami Vivekananda was the founder of the Belur Math and the Ram Krishna Mission. His main line of teaching was unity and equality in religion and spirituality; he preached an awakening to unity and equality and missionary work to that end; and service and self-sacrifice were the two main outward and visible signs of grace

It is obvious that with very little distortion this teaching was a powerful weapon in the hands of an idealist revolu-

tionary like Arabinda Ghosh and the extracts from his pamphlets that are given in the red book show that the distortion is the introduction and emphasis of *Sakti* or force. The very missionary methods of the Vivekananda mission were at hand to be adapted by the revolutionaries. While at the same time the prestige given by the reputation and the social service of the Ram Krishna Mission to Vivekananda's teachings could be misappropriated by missionaries to cover their distorted teachings. The danger of this distortion is fully admitted by Saradananda Swami.

The Red Book gives instances showing the connection of seditionists with the Ram Krishna Mission upto 1914; and Mr. Tindall has kindly gone through the history sheets of those we have dealt with under Defence of India Act and has put up a note showing similar instances of connection. Some of these are of course the same as refe'red to in the Red book, but the majority are fresh and many of a recent date. It is not for a moment suggested that these men are revolutionaries because of their connection with the Ram Krishna Mission, but I think that there is reason to suppose that in many cases they belonged to the Mission because they were revolutionaries. It was the Ram Krishna Mission atmosphere of special service and self renunciation based on idealism (whether religious or not) that attracted them and it is by reason of this very atmosphere that they would naturally find the Ram Krishna Mission a suitable recruiting ground.

I may illustrate what I mean by what is the almost invariable tale of the downward course told by the very large number of youths who have given us their revolutionary his-

tory. The recruiter first speaks of the present condition of India ; the blackness of the future depends on what he considers the receptivity of the recruit ; then he lends him selected works of Vivekananda and speaks of social service and self sacrifice ; then comes the lives of Garibaldi, Mazzini etc , and social service and self sacrifice is converted solely and sacrifice for the motherland ; then comes the doctrine that money is necessary for service for the motherland and that dacoity is the only way to get money ; later there is the doctrine that obstacles must be removed by assassination. In other words, the recruiter deliberately sets out to create the Ram Krishna atmosphere before he proceeds to sow his revolutionary seeds and a priori the work is easier where that atmosphere already exists unless there is already an antidote to the poison in the shape of already assimilated Ram Krishna spiritual teaching. We have the definite statement from the boy that he was told after initiation by his recruiter that revolutionaries did join the Ram Krishna Mission with the clear and sole intention of recruiting, and as Mr. Tindall's note shows a considerable number of revolutionaries of every degree of guilt say themselves that they are Ram Krishna Mission workers. They are not included in the list of 201 members, they may not be even outside members, or members of branches in all cases, they may belong to unaffiliated branches, but they are accepted by their victims as Ram Krishna Mission workers and they use to the full the prestige given to them by that position.

I think there is every justification for the statement that the revolutionaries "often seize the opportunity which

membership in a charitable society like the Ram Krishna Mission, or participation in the relief of distress gives them to meet and to influence boys who have noble ideas." This is largely the history of recruitment. I do not for a moment mean that they join the 201 members on the list of the Mission ; but they do seize the opportunity that membership of a charitable society like the Ram Krishna Mission gives and they become Ram Krishna Mission workers whether in fact their name is borne on any roll kept by the Mission management.

But although these recruiters are in many cases Ram Krishna Mission workers so far as their victims are concerned and use the prestige of the Mission in their unholy work, and although in some cases they stay at the Belur Math, and in at least one case have used it as a hiding place from the police, and although some recruitments have taken place in the Belur Math grounds and plots been hatched there, the Memorialists are no doubt correct in saying that the Mission authorities have no knowledge of this, and have no direct responsibility. The facts set out above show the danger of the Ram Krishna teaching and prestige and it is incumbant on the Mission authorities to take the very greatest precautions. This they recognise as is shown by the warning to the public they issued in 1914. But the danger cannot be averted once for all by a single warning or even by a scrutiny of the list of 201 ; we may take it that the Mission is doing all it can to keep undesirables out and, to keep the Mission free from politics. But its duty to the public in this matter can only be discharged by constant declaration of its abhorrence of the perversion of its teaching

and methods ; the tales told by detenus show that the warning has been forgotten.

I think that the proper answer to the memorial is a letter from the P.S G that H.E. fully recognises the charitable work and social service carried out by the Ram Krishna Mission and the earnest desire of the management to exclude every political propaganda from the aims and objects of the Mission and would deeply regret their charitable work being hampered by any alienation of public sympathy. H.E. was strongly impressed from the information in the possession of Government, with the necessity, a necessity which was recognised by the Governing body themselves in 1914, of warning the public against the unscrupulous use that is being made of the deservedly high reputation of the Ram Krishna Mission to ruin and pervert for their own purposes inexperienced youths of noble ideals

I would strongly deprecate any action that could be interpreted as official approval of Swami Vivekananda's teachings and a visit of the Belur Math under the present circumstances would I feel be so interpreted. I do not mean to urge in any way that Vivekananda's teachings are in themselves seditious or harmful. But they are at present the recognised first step to initiation in revolutionary ideas ; and anything that could be pointed to show that Government approved of them would facilitate the success of the recruiter. The fact that Vivekananda's brother is at present in Belur working for the Germans, though it has no relevance whatever to Vivekananda's teachings, must to the revolutionary facilitate the progress from Vivekananda's teachings to sedition.

(3) *Note of P. C. Lyon on the above subject dated 4, February 1917. Vide ibid.*

The evidence directly bearing upon the work of the Ram Krishna Mission in connection with political activities of a dangerous character has been admirably summarised in the above note and the papers below. Mr. Tegart's able note of 1914 deals very fully with the case up to that year. And H.E. is aware that there is other evidence—in fact he founded much of his speech upon it—to show that charitable and philanthropic work is deliberately adopted by sections of the revolutionary party as a cloak for their own schemes and in order to secure popularity for their organisations. The papers show that His Excellency was entirely justified in the language that he used, and I would suggest that to take any action now which might be interpreted as a retractation of any part of the valuable warning contained in the Durbar speech would be a mistake. The fullest sympathy with the real aims and objects of the Mission was expressed by H.E. at the same time, and the memorialists can make much of this, and there is nothing in their representation which calls for any modification or qualification of the words of the speech.

I agree with Mr. Stephenson, accordingly, as to the reply which should be given. I think that it should reiterate His Excellency's approval of the social service rendered by the Mission and his acknowledgment of the essentially religious and non-political aims of this society, but it should go on to say that H.E. has carefully considered again the words of his speech in the light of the representation now made and finds nothing that he can alter or qualify ; he believes that

the warning he conveyed to the public was in the best interests of the Mission itself, and he knows it to have been justified by facts, and he has no doubt that the members of the Mission will have little difficulty in controverting any misinterpretation of his words that may have gained temporary currency.

I would join also in deprecating, with Mr. Stephenson any visit by H E. to the Belur Math at the present time. I feel certain that, in view of the fact that H.E. has, so far as I am aware, never visited the Math before, such action would be interpreted in a manner that would weaken the excellent effect of the Durbar speech.

(4) *Letter from Saradananda, Secretary Ram Krishna Mission to Mr. Gourlay, Private Secretary to the Governor, dated. March 12, 1917, vide ibid.*

1, Mukherji Lane, Baghbazar,
Calcutta
12th March 1917.

Dear Mr. Gourlay,

I have to the idea on my second thought, that it is indeed a grave responsibility that you have laid on us in telling us to write to you suggesting what our noble Governor ought to say to remedy the evil done to our Mission work as has been put forth in our Memorial to His Excellency. As individual members of the Mission we feel we have achieved our end, if we have succeeded in convincing His Excellency of the truth of our statement

that our Mission is a pure and simple religious one and has nothing to do whatsoever with politics. And we shall never be able to pardon ourselves if even the shadow of such a selfish thought cross our minds as that His Excellency would or say anything for our work by compromising his own high position, after the unique kindness and courtesy that we have received at His Excellency's hands lately.

We would accept therefore, with all gratefulness anything that His Excellency will feel inclined to say in answer to our humble Memorial without putting his own noble self to any false position and which will make the people understand clearly that our Mission has the sympathy and approval of the Government. Perhaps if it is not unwise and not compromising himself, His Excellency might point out that the only mention of the Ram Krishna Mission in his speech was for two reasons namely, that he wanted to show his unique sympathy to the good works that he had seen the Mission doing all along, and secondly, that though. His Excellency was conscious of the fact that a religious Mission like the Ramkrishna mission must work amongst good and bad men alike and for that purpose more amongst the latter class, to correct and guide them to the highest ideal of life—yet he was anxious that the good works of the Mission might not get undermined and swamped ultimately by coming in too much contact with the bad elements of the society. His Excellency therefore gave the Mission a simple warning in his speech and that he would be very sorry if that is being misunderstood by the public as an intimation to all good

men to shun the Mission and to withdraw their help, financial or otherwise to its good works.

We do not see any other way, dear Mr. Gourlay, out of the difficulty that has arisen. And if you think that even in saying the above His Excellency will have to compromise his own position then we request you not to mention of it to His Excellency. We shall then abide contentedly by any other decision which His Excellency might think fit.

With our most kind regards to yourself and our gratefulness and best prayers for His Excellency, I remain, dear Mr. Gourlay,

Always your servant in the Lord,
SARADANANDA
Secy. Ramkrishna Mission.

5. *Answer to the above letter given by His Excellency Lord Carmichael, dated March 26, 1917, vide ibid.*

Dear Sir,

I thank you for having come to see me and for the trouble you have taken to tell me about the origin of the Ram Krishna Mission, and its aims and objects.

I read with great interest the memorial which the Mission authorities submitted to me some time ago. I regret very much to hear that words used by me at the Durbar in December last regarding the Mission should have led in any way to the curtailment of the religious, social and educational work the Mission has done and is doing. As you now realize my object was not to condemn the Ram Krishna Mission and its members. I know the character of the

Mission's work is entirely non political, and I have heard nothing but good of its work of social service for the people. What I wanted to impress upon the public is this charitable and philanthropic work such as the Mission undertake is being adopted deliberately by a section of the revolutionary party as a cloak for their own nefarious schemes and in order to attract to their organisations youths who are animated by ideals such as these which actuate the Missson, with the intention of perverting these ideals to their own purposes; and with this object unscrupulous use is being made of the name and reputation of the Ram Krishna Mission.

I have full sympathy with the real aims of the true Ram Krishna Mission and it was this abuse of the name of the Mission that I wished to prevent. I hope the words I used will help the Mission to guard against the illegitimate use of its name by unscrupulous people.

Yours sincerely,
CARMICHAEL

6. *Excerpt from the report of C. Tindall, officiating Secretary, Legislative Department, Bengal, date February 1, 1917 and submitted to H. L. Stephenson Chief Secretary, Bengal. Vide Govt. of Bengal, Political Deptt, Confidential. File no. 111/1917.*

Hon. Mr. Stephenson,

You have asked me to record the instances of attempts at perversion of youths to revolutionary ideas through the use of the Ram Krishna Mission as a field of recruitment.

I therefore record the result of my scrutiny.

I first invite attention to File No. 612. C where Bairagi Tripathi a member of the Ram Krishna Mission, now expelled from Bengal under His Excellency's order declared in 1915 at a public meeting in Beadon Square that "starvation was a thing unknown till the advent of the Britsh." This file may be read with the confession of Jogesh Chanda Ray in file 438/C that he was perverted by Ramkrishna literature and agreed to join the revolutionaries on the ground that Britsh rule was causing famine.

The following members interned or absconding are or were Ramkrishna Mission workers.

465/C. Brajendra Nath De. He is a Ram Krishna Mission worker as a collector of subscriptions and Ram Krishna literature was sent to him by a revolutionary recruiter. His name appears in the Revolutionary cypher.

290/C. According to Sanat Chakravarty, Gyan Maharaj of the Belur Math went on famine relief in Burdwan and was a constant visitor at the house and shop of Makhan Sen, his name being mentioned in the confession in conjunction with four prominent revolutionaries.

491/C. Moti Lal Biswas was identified as a dacoit in 1914 by the son of the complainant, and is implicated in that dacoity by a self confessed murderer, and also as a recruiter. He himself confesses his revolutionary association. He is a Ram Krishna Mission worker and, as his correspondence shows, he is in active touch with other Ram Krishna Mission workers and admits that he goes to stay at the Belur Math. He is said by two leading members of the party to be still active as a revolutionary.

414/C. Kunja Lal Saha arrested at the Muraripukur garden house in the Alipur Bomb case stayed at the Belur Math and was a Ram Krishna Mission worker both before and after the Alipur bomb case. He said that at the Muraripukur Garden house Birendra Kumar Ghosh (convicted of murder) "taught him to sacrifice his life for the sake of the Philanthropic work, i.e. work for the country". This Kunja Lal Saha was a close friend of Jotin Mukherji (killed at Balasore and active in the German conspiracy).

613/C. Paresh Mohan Das confesses to murder and says "Some of the members of the Ram Krishna Mission are members of the anarchist party. Some of our men entered the Ram Krishna Mission to recruit"

Nripendra Nath Ghosh advocate of murder is Ram Krishna Mission worker (Dacca Branch) as is also the absconding revolutionary leader Jotin Mukherji. Nripendra was present at meetings where the rising was proposed with the help of the Germans who were to supply the arms and ammunition.

গ্রন্থপঞ্জী

এই বই রচনায় যে সব মূল উপাদান (Primary Sources) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি বহুলাংশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেখ্যাগারে (W. B. State Archives) সংরক্ষিত আছে। এগুলির মধ্যে Government of Eastern Bengal & Assam, Political Branch, Cofidential এবং Government of Bengal, Political Department, Political Branch, Confidential files প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তথ্য সূত্র অংশে এগুলি সম্পর্কে বিশদ ভাবে হদিস দেওয়া হয়েছে। এগুলি ছাড়া ঐ একই স্থানে সংরক্ষিত West Bengal State Committee for Compilation of Freedom Fight Movement in India, Bengal Region কর্তৃক সঙ্কলিত Paper 45, Bundle 15 : A note on the Ramkrishna Mission এবং Paper 49, Bundle 15 : Political Activities of the Sadhus upto 1909 শীর্ষক দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রয়াত ঐতিহাসিক অধ্যাপক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ-এর নির্দেশে ১৯৫০ সালে এই দুটি পত্র রচিত হয়।

রাজ্যের পুলিশ বিভাগ অর্থাৎ Special Branch এবং Intelligence Branch-এর গ্রন্থাগার ও রেকর্ড ঘরেও আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত নানাবিধ প্রামাণ্য নথি-পত্র রয়েছে। কিন্তু এই দুই জায়গায় প্রাপ্ত নথিগুলির রেফারেন্স নম্বর প্রকাশ করা নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে তথ্য নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তবে আগ্রহী পাঠক পূর্বে উল্লিখিত Paper nos. 45 এবং 49 পাঠ করলে এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ নির্দেশ লাভ করতে পারেন।

উপরোক্ত উপাদান ছাড়া ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত অন্যান্য যে সব বই, পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল।

Books (English)

Bhattacharya Haridas and others, (ed.), *The Cultural Heritage of India ;* Vol. 2., Calcutta.

Burke Marie Lousie, *Swami Vivekananda in the West,* Part one, Calcutta, 1982.

Complete works of Sister Nivedita, Vols, 1-5, Calcutta, 1975-82.

Complete works of Swami Vivekananda, Vols. 1-8, Advaita Ashram edition, Calcutta, 1979.

Fuchs Stephen, *Rebellious Prophets, A study of messianic movements in Indian Religions*, Bombay, 1965.

Gambhirananda Swami, *History of the Ramkrishna Math and Ramkrishna Mission*, Calcuttta, 1983.

Ghose Aurobindo, *Uttarpara Speech* (4th end.), Calcutta, 1943.

Ghose Sankar, *First Rebels*, Calcutta, 1981.

Heimsath Charles H,. *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, Princeton, 1964.

Isherwood Christopher, *Ramkrisna and his disciples*, Calcutta, 1980.

Letters from Colombo to Almora, Calcutta, 1978.

Letters of Swami Vivekananda, Calcutta. 1981.

Life of Sri Ramkrtshna, compiled from various authentic sources, Calcutta, 1977.

Life of Swami Vivekananda by his eastern and western disciples, Vol. 1, 1979, Vol. 2. 1981, Calcutta.

Majumdar B. B., *Militant Nationalism in India*, Calcutta, 1966.

Majumdar R. C., *History of the freedom Movement in India*, Vol. 1, Calcutta, 1971.

—(ed.), *Swami Vivekananda Centenary Memorial* Vol, Calcutta, 1963.

Mukherjee Haridas and Uma, *Sri Aurovinda and the New Thought in Indian Politics*, Calcutta, 1964.

Prabrajika Atmaprana, *Sister Nivedita*, Calcutta, 1977.

Rolland Romain, *The life ef Vivekananda & the Universal Gospel*, Calcutta, 1979.

Rowlatt S. A. T., *Reports of the Sedition Committee*, Calcutta, 1973.

Sarkar Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal*, 1903-1908, New Delhi, 1977.

Tripathi A., *The Extremist Challenge*, Calcutta, 1967.

Wolpert S. A., *Tilak and Gokhale*, Berkeley, 1962.

Journals, leaflets, newspapers and others :

Amrita Bazar Patrika, 7th September 1894. (For Town Hall meeting in Calcutta dated 5. 9. 1894).

Bengalee, 20th September 1902. (An account of the condolence meeting held in the Calcutta Town Hall dated 19. 9. 1902).

Englishman, 8th April 1914. ('A Warning to the public' issued by Swami Saradananda).

Hindu Patriot, 14th October 1912. (A general report of Ramkrisna Misson)

Indian Mirror, 20th February 1897. (Swamiji's reception at Calcutta dated 19. 2. 1897).

— , 2nd March 1897. (Swamiji's reception at Shobhabazar Rajbati.).

— , 5th March 1897. (Swamiji's speech at Calcutta on Vedantism.).

Prabuddha Bharat or Awakened India, Vol. XXII, No. 246, January 1917.

The First General Report of The Ramkrishna Mission.

The Fourteenth Annual Report of the Ramkrishna Mission Home of Services at Benares for 1914.

The Ramkrishna Mission (containing Memorandum of

the Association of the Ramkrishna Mission and Rules and Regulations of the Ramkrishna Mission.)

The Ramkrishna Mission. (Printer Sri Surendra Nath Bhattacharya.)

বাংলা বই

কানুনগো হেমচন্দ্র, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, কলকাতা, ১৯২৮

গুহ নলিনী কিশোর, বাংলায় বিপ্লববাদ, কলকাতা, ১৯৫৪

ঘোষ কালীচরণ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ, কলকাতা,

ঘোষ বারীন্দ্র কুমার, আত্মকাহিনী, কলকাতা, ১৩২৯

বসু শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, কলকাতা, প্রথম খণ্ড, ১৯৮২ ; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮১ ; তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮৩ ; চতুর্থ খণ্ড, ফাল্গুন ১৩৮২ ; এবং পঞ্চম খণ্ড, ১৯৮১

মুখোপাধ্যায় যাদুগোপাল, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, কলকাতা ১৯৬৩

রায়চৌধুরী গিরিজা শঙ্কর, ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ, কলকাতা, ১৯৬০

শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ, কলকাতা, ১৯৫৬

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী, কলকাতা, ১৯২৭

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১-১০ খণ্ড (উদ্বোধন), কলকাতা, ১৩৮৮

হালদার জীবনতারা, বাংলার প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৬৫

বাংলা পত্র-পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা (রবিবাসরীয়), ডিসেম্বর ১৯৮২

কর বিমল (সম্পাদিত), শিলাদিত্য, মার্চ ১৯৮৩

ঘোষ সুরজিৎ (সম্পাদিত), প্রমা, জানুয়ারী ১৯৮২

সেনগুপ্ত সমরেন্দ্র (সম্পাদিত), বিভাব, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৮ ও ১৩৮৯

সমাজ শিক্ষা, ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৭৯

রাখাল বেণু, মাঘ ১৩৮৭ চৈত্র ১৩৮৮, বিপ্লবী হেমচন্দ্র ও রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি সংখ্যা ১ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র